আচার্য জগদীশচন্দ্র

মণি বাগচি

ভারতের বিজ্ঞান সাধক (১)

আচার্য জগদীশচন্দ্র

মণি বাগচি

দিবাকর সেন কর্তৃক
পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত

শৈব্যা ● প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

প্রকাশক :
রবীন বল
৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ : রঞ্জিত দাস

প্রথম মুদ্রণ : বুদ্ধ পূর্ণিমা ১৩৮৫
দ্বিতীয় সংস্করণ, রথযাত্রা ১৩৮৮
তৃতীয় সংস্করণ, রথযাত্রা ১৩৯৪, জুলাই ১৯৮৭

মূল্য : দশ টাকা

মুদ্রাকর :
রামকৃষ্ণ সারদা প্রিন্টার্স
শ্রীসত্যনারায়ণ মণ্ডল
৩৪, শ্যামপুকুর স্ট্রীট
কলকাতা-৪

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ভূমিকা

এখন আমরা বিজ্ঞানের প্রখর যুগে বাস করছি। বিজ্ঞান এনে দিয়েছে আমাদের জীবনে নতুন চিন্তা, নতুন চেতনা। জ্ঞানের পাশাপাশি তাই চলেছে বিজ্ঞানের চর্চা। 'ভারতের বিজ্ঞান সাধক' এই পর্যায়ে আমি ছয় জন ভারতীয় বিজ্ঞানীর জীবন ও আবিষ্কার সম্পর্কে আলোচনা করব এক-একটি গ্রন্থে। এঁরা প্রত্যেকেই বিশ্বের বিজ্ঞানী সমাজে মর্যাদার আসন লাভ করেছেন এবং সেই সঙ্গে তাঁদের জন্মভূমি ভারতবর্ষকে বসিয়েছেন গৌরবের আসনে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এঁদের অবদান এনে দিয়েছে বিজ্ঞানের ইতিহাসে নবযুগ।

এই পর্যায়ের প্রথম গ্রন্থ 'আচার্য জগদীশচন্দ্র'। বিজ্ঞান-জগতে নিউটন ডারুইন প্রভৃতির স্থান যে সারিতে, জগদীশচন্দ্র বসুর স্থানও ঠিক সেই সারিতে। তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার ফলে আজ সমস্ত বিজ্ঞান-জগৎ এই ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের অতুলনীয় প্রতিভার কাছে শ্রদ্ধায় নতশির। জগদীশচন্দ্রের প্রতিভা ছিল বহুমুখী। তাঁর স্বদেশপ্রেম ছিল অসাধারণ। নানাবিষয়ে নানারকমের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সার্থক তাঁর জীবন। তিনি প্রকৃতির গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন, তার অন্তঃপুরে বিচরণ করেছেন স্বচ্ছন্দে। এমন মনীষা বিজ্ঞানের ইতিহাসে খুব বেশি নেই।

মণি বাগচি
৯০ বাগুইআটি রোড, কলকাতা-২৮

নতুন সংস্করণের ভূমিকা □ □ □ □ □ □ □ □

মূল গ্রন্থটি সঙ্গে সাযুজ্য রেখে গ্রন্থটিকে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত করা হলো। আশা করি সংস্করণটি কিশোর পাঠক-সমাজে আদৃত হবে।

দিবাকর সেন
তত্ত্বাবধায়ক : জগদীশ বসু গন্ত্রাগার
বসু বিজ্ঞান মন্দির
৯৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড
কলকাতা-৯

উৎসর্গ

'হে তপস্বী, তুমি একমনা
নিঃশব্দেরে বাক্য দিলে ; অরণ্যের অন্তর বেদনা
শুনেছ একান্তে বসি ; মূক জীবনের যে ক্রন্দন
ধরণীর মাতৃবক্ষে নিরন্তর জাগাল স্পন্দন
অঙ্কুরে অঙ্কুরে উঠি প্রসারিয়া শত ব্যগ্র শাখা,
পত্রে পত্রে চঞ্চলিয়া শিকড়ে শিকড়ে আঁকাবাঁকা
জন্ম মরণের দ্বন্দ্বে, তাহার রহস্য তব কাছে
বিচিত্র অক্ষররূপে সহসা প্রকাশ লভিয়াছে।
প্রাণের আগ্রহবার্তা নির্বাকের অন্তঃপুর হতে
অন্ধকার পার করি' আনি দিলে দৃষ্টির আলোতে
তোমার প্রতিভাদীপ্ত চিত্ত মাঝে কহে আজি কথা
তরুর মর্মের সাথে মানব মর্মের আত্মীয়তা ;
প্রাচীন আদিমতম সম্বন্ধের দেয় পরিচয়।
হে সাধক শ্রেষ্ঠ, তব দুঃসাধ্য সাধন লভে জয়।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিক্রমপুরের রাড়িখাল গ্রাম।

ঢাকা জেলার (এখন বাংলাদেশের অন্তর্গত) বিখ্যাত বিক্রমপুর—হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান। আমাদের দেশের অনেক কৃতী সন্তানের জন্মভূমি বিক্রমপুর। এই বিক্রমপুরের রাড়িখালে বাস করতেন এক বসু পরিবার। এই পরিবারের সুসন্তান ভগবানচন্দ্র বসু ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তখনকার দিনে শিক্ষিত বাঙালীদের কাছে এটাই ছিল বড় চাকরি। সরকারি চাকরি করলেও ভগবানচন্দ্র মনেপ্রাণে দেশকে ভালবাসতেন। দেশের কল্যাণ-চিন্তা সর্বক্ষণ তাঁর মনে জাগরুক থাকত। কিসে দেশের উন্নতি হবে, কেমন করে জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও শিল্পে দেশের লোক উন্নত হবে—এসব কথাই ভাবতেন ডেপুটি ভগবানচন্দ্র বসু।

এই ভগবানচন্দ্রের প্রথম সন্তানরূপে জগদীশচন্দ্র বসু জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের পৈতৃক বাড়িতে ১৮৫৮ সালের ৩০ নভেম্বর। 'আমি যখন জন্মাই তখন সমস্ত ভারতবর্ষ আলোড়িত হয়ে উঠেছিল সিপাহী বিদ্রোহের ফলে। মায়ের কাছে শুনেছি, আমাদের গ্রাম পর্যন্ত সেই ঘটনায় আলোড়িত হয়ে উঠেছিল।' এই কথা বলেছেন জগদীশচন্দ্র

নিজে। সেদিন বাংলার এক অখ্যাত পল্লীতে বসু-পরিবারে যে শিশুটি জন্মগ্রহণ করেছিল, কালক্রমে তিনিই যে একজন বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক হয়ে জগৎসভায় ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করবেন, লাভ করবেন বিজ্ঞান লক্ষ্মীর বরমাল্য—একথা কি কেউ ভাবতে পেরেছিল ? এই দিগ্বিজয়ী বৈজ্ঞানিকের জীবনকাহিনী বাঙালী তথা ভারতবাসীর চিরদিনের গৌরব ও গর্বের বিষয়।

পাঁচ বছর বয়সে বাংলা স্কুলে ভর্তি হলেন জগদীশচন্দ্র। তখন ছেলেদের ইংরাজী স্কুলে পাঠানো অভিজাত্যের লক্ষণ বলে গণ্য হতো। ছেলেবেলায় গ্রামের সরল পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন জগদীশচন্দ্র। তখন থেকেই তিনি একদিকে যেমন প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক বোধ করতেন, তেমনি গ্রামের জনসাধারণের সঙ্গে খেলাধূলা করে তাদের সঙ্গেও আত্মীয়তা বোধ করতেন। স্কুলে সহপাঠীদের প্রায় সবই ছিল সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর শিশু। তাদের সঙ্গে মিশে, শিশু জগদীশচন্দ্রের কীটপতঙ্গ ও গাছ-পালার স্বভাব লক্ষ্য করার মত একটি মানসিকতা গড়ে ওঠে। সমাজ জীবনের এই প্রথম পাঠই জগদীশচন্দ্রকে প্রকৃতিমুখী করে তোলে। একথা জানা যায় তাঁর নিজের কথাতেই। তিনি বলেছিলেন, "স্কুলে দক্ষিণ দিকে আমার পিতার মুসলমান চাপরাশির পুত্র এবং বাম দিকে এক ধীবর পুত্র আমার সহচর ছিল। তাদের নিকট আমি পক্ষী ও জলজন্তুর বৃত্তান্ত স্তব্ধ হইয়া শুনিতাম। সম্ভবত, প্রকৃতির কার্য অনুসন্ধানে অনুরাগ এই সব ঘটনা হইতেই আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল।" শিশু জগদীশচন্দ্রের মনে আরও দু'একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এর উল্লেখ রয়েছে জগদীশচন্দ্রের ভাগিনেয় অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসুর জীবনস্মৃতিতে। তিনি লিখেছিলেন, "একদা তিনি (জগদীশচন্দ্র) চারটি গুবরে পোকা ধরে সুতো দিয়ে বেঁধে দেশলাই বক্সের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন। তাতে সুন্দর একটি রথ তৈরী হয়েছিল। এইখানে ভবিষ্যৎ প্রকৃতিবাদীর সঙ্গে

ভবিষ্যৎ ইঞ্জিনিয়ারের মিলন ঘটেছে। পরবর্তীকালে আমরা তাকে স্মল পাম্পিং ব্যবস্থা দ্বারা ছোট ছোট নালির সাহায্যে একটা পোলের তলা দিয়ে জল সরবরাহ ব্যবস্থা করতে দেখি। বাল্যকালে তিনি জেলেদের সঙ্গে জন্তু পুষতেন ও তাদের জন্য খাঁচা তৈরী করতেন। পরবর্তীকালে যখন তাঁর পিতা বর্ধমানের ম্যালেরিয়া মহামারীতে অনাথ ছেলেদের জন্য একটি শিল্পশিক্ষা কেন্দ্র খুলেছিলেন তখন কিশোর জগদীশচন্দ্র তাঁর মায়ের কাছে চেয়ে চিন্তে যোগাড় করা ভাঙা পিতল বাসনপত্র ঐ কারখানায় গালিয়ে একটা ছোট্ট পিতলের কামান তৈরি করেছিলেন।

বাবা যেমন উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, জগদীশচন্দ্রের মায়ের প্রকৃতিও ঠিক সেইরকম ছিল। তিনি ছিলেন একজন উদার-হৃদয়া, স্নেহশীলা ও কর্তব্যপরায়ণা গৃহিণী। তিনিও জাতিবিচার মানতেন না, ছোট-বড় ভেদজ্ঞান তাঁর ছিল না। এই রকম আদর্শ পিতা-মাতা পেয়েছিলেন বলেই না ছেলেবেলা থেকেই জগদীশচন্দ্র প্রকৃত মনুষ্যত্বের শিক্ষালাভ করেছিলেন। তাঁর জন্মকালে ভগবানচন্দ্র ফরিদপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন—পুত্রের শৈশব-শিক্ষা তাই এখানকার বাংলা স্কুলেই হয়েছিল। তখন ফরিদপুরে প্রতি বছর একটা করে মেলা ও প্রদর্শনী হতো। এই উপলক্ষে কলকাতা থেকে যাত্রার দল আনা হতো। যে ক'দিন যাত্রা হতো, বালক জগদীশচন্দ্র রাত জেগে সে ক'দিন যাত্রা শুনতেন। যাত্রার পালা বেশির ভাগ রামায়ণ মহাভারতের গল্প নিয়ে বাঁধা হতো। 'এইভাবেই আমি রামায়ণ-মহাভারতের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী ছেলেবেলায় আমার মনে খুব দাগ কেটে দিয়েছিল। কর্ণের চরিত্র আমার খুব প্রিয় ছিল।'

বাংলা স্কুলে লেখাপড়া শেষ হলে ভগবানচন্দ্র ছেলেকে পাঠালেন কলকাতায়। এখানে জগদীশচন্দ্রকে প্রথমে হেয়ার স্কুলে, পরে সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। তখন তাঁর বয়স মাত্র ন'বছর।

ভগবানচন্দ্র তখন ফরিদপুর থেকে বর্ধমানে বদলি হয়েছেন। তিনি তখন এখানকার সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট। স্কুলের ছাত্রাবাসেই ছেলের থাকার ব্যবস্থা হলো। অল্পদিনের মধ্যেই জগদীশচন্দ্র একজন মেধাবী ছাত্র বলে পরিগণিত হলেন। বুদ্ধির তীক্ষ্মতা, পাঠে মনোযোগিতা আর বিনয়-নম্র ব্যবহার দেখে সকল শিক্ষকই তাঁর প্রশংসা করতেন। স্কুলে ভর্তি হওয়ার অল্পকালের মধ্যে তিনি সুন্দর ইংরাজী শিখেছিলেন —বলতে ও লিখতে।

স্কুলের কাছেই ছাত্রাবাস। জগদীশচন্দ্র একা একটি ঘরে থাকতেন। স্কুলের শেষ ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সোজা চলে আসতেন হোস্টেলে। তারপর বিকেলবেলায় যতটুকু খেলাধূলা করা দরকার তা করতেন। সন্ধ্যা হলেই নিজের ঘরটিতে বই নিয়ে বসতেন। ছাত্রজীবনে তিনি শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা খুব মেনে চলতেন। লেখাপড়াকে তিনি তপস্যার তুল্য মনে করতেন।

১৮৭৫।

জগদীশচন্দ্র কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করলেন। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজেই ভর্তি হলেন বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে। তখন কলকাতায় যে তিনটি ভালো কলেজ ছিল এই কলেজটা ছিল তারই অন্যতম। মিশনারী কলেজ, এখানকার ধরন-ধারণই আলাদা। ফাদার লাফোঁ ছিলেন এই কলেজের একজন অধ্যাপক। নামকরা বৈজ্ঞানিক। কলেজে পড়বার সময় জগদীশচন্দ্র এঁর প্রতি খুব অনুরক্ত হন।

একদিন।

তাঁর প্রিয় ছাত্রটিকে সঙ্গে নিয়ে ফাদার লাফোঁ গিয়েছেন বোটানিক্যাল গার্ডেনস দেখাতে। সঙ্গে ছিল কলেজের আরো কয়েকটি ছাত্র। গঙ্গার ধারে এই জায়গাটি জগদীশচন্দ্রের খুব ভালো লাগল। বেড়াতে বেড়াতে কৌতূহলী ছাত্র গাছপালা সম্পর্কে কত রকমের প্রশ্ন করেন।

এই বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়ানো সম্পর্কে কিশোর জগদীশচন্দ্র তাঁর পিতাকে লিখেছিলেন, "গতকাল আমার অধ্যাপকের সহিত শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখিতে গিয়াছিলাম। কলিকাতার নিকটে যে এইরূপ একটি চমৎকার পরিবেশ আছে তাহা পূর্বে জানিতাম না। গাড়ী হইতে নামিয়া বাগানের ফটকে উপস্থিত হইয়া চারিদিকে তাকাইয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ফরিদপুর হইতে আসিয়া অবধি শহরের কৃত্রিম আবেষ্টনীর মধ্যে আমার প্রাণ যেন হাফাইয়া উঠিতেছিল। তাই গঙ্গার তীরে এই বিস্তৃত উদ্যানটি দেখিয়া আমার মন জুড়াইয়া গেল। বিকাল অবধি বেড়াইয়া আনন্দ ও শিক্ষা দুইই লাভ করিয়াছি।"

কুড়ি বছর বয়সে জগদীশচন্দ্র বি. এ. পাশ করলেন। বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবেই তিনি এই পরীক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল বিলেত গিয়ে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবেন ও জজ ম্যাজিস্ট্রেট হবেন। বাবার মাথায় তখন বিপুল ঋণের বোঝা। নানা রকম ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে ভগবানচন্দ্র তখন একরকম সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। কাজেই একটা মোটা মাইনের চাকরি করে, পিতাকে ঋণমুক্ত করবেন—এই আকাজ্ক্ষাতেই তিনি সিভিল সার্ভিস পড়তে ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর বাবার ইচ্ছা ছিল অন্যরকম। ছেলেকে বিলেত পাঠাবার ইচ্ছা অবশ্য তাঁর ছিল—সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে নয়, উচ্চশিক্ষা লাভ করতে। ইংল্যাণ্ড গিয়ে বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা লাভ করে, ছেলে দেশে ফিরে এসে কৃষি-উন্নতির কাজে মন দেবে, এটাই ছিল ভগবানচন্দ্রের মনোগত ইচ্ছা।

অন্যদিকে তাঁর মায়ের এতটুকু মত ছিল না যে ছেলে বিলেত যায়। আপত্তির কারণটা অবশ্য গুরুতর ছিল। যে বছর জগদীশচন্দ্র কলেজে ভর্তি হন সেই বছরে তাঁর ছোট ভাইটির মৃত্যু হয়। তখন তার বয়স হয়েছিল মাত্র দশ বছর। ভগবানচন্দ্র পুত্রশোক সামলাতে পেরেছিলেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের মা পারেন নি—কিছুতেই তাঁর

মন প্রবোধ মানে নি। চোখের জল শুকোয় নি। স্বামীকে বললেন, জগদীশকে বিলেত পাঠিয়ে কাজ নেই। তাহলে আমি কি নিয়ে থাকব? শেষ পর্যন্ত অবশ্য মা তাঁর পুত্রের বিলেত যাওয়াতে মত দিয়েছিলেন। শুধু মত দেওয়া নয়, ছেলের ইংল্যাণ্ড যাওয়ার খরচ পর্যন্ত দিয়েছিলেন নিজের গহনা বেচে। কারণ ছেলেকে বিলেত পাঠাবার সঙ্গতি তাঁর স্বামীর তখন ছিল না। 'আমার মায়ের স্নেহেতেই আমি এত বড়ো হতে পেরেছি।' একথা বলেছেন জগদীশচন্দ্র।

তারপর একদিন শুভক্ষণে পিতামাতার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে যুবক জগদীশচন্দ্র ইংল্যাণ্ড যাত্রা করলেন।

ডাক্তারী পড়তে বিলেত গিয়েছিলেন জগদীশচন্দ্র।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডাক্তারী পড়া হয় নি। ১৮৮১ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। এখানকার পরিবেশ দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পীঠস্থানই বটে! এখানকার অধ্যাপকরা সবাই যেন জ্ঞান-তপস্বী।

জগদীশচন্দ্র যখন এখানে ছাত্র হয়ে এলেন তখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি সারা য়ুরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন—মাইকেল ফস্টর, ভাইনস, জন ফ্রান্সিস ডারুইন ও লর্ড র‍্যালে। এঁরা প্রত্যেকেই ভারতীয় ছাত্র জগদীশচন্দ্রের প্রতিভায় আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন। এঁদের প্রত্যেকের প্রভাব তাঁর তরুণ মনের ওপর পড়েছিল। ছাত্রজীবনের অনেক পরে জগদীশচন্দ্র যখন তাঁর আবিষ্কারের বার্তা নিয়ে ইংল্যাণ্ডে এসেছিলেন তখন এরাই তাঁকে বিদগ্ধসমাজে পরিচিত করে দিয়েছিলেন। তাই আজীবন তিনি কেমব্রিজের এই তিনজন আচার্যের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণে রেখেছিলেন।

দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়বার সময়ে জগদীশচন্দ্র পদার্থবিদ্যা,

রসায়নবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা—এই তিনটি বিষয়ের ওপর বিশেষ মনোযোগ দিলেন। চার বছর পরে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে সর্বোচ্চ উপাধি 'ট্রাইপস' (Tripos) লাভ করলেন এবং সেই সঙ্গে একটি বৃত্তিও পেলেন। এ বড়ো কম কৃতিত্বের কথা ছিল না। একই বছরে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানে স্নাতক হলেন। ইংল্যাণ্ডে তাঁর ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তি এইখানেই ঘটে। পড়া শেষ হলো বটে, কিন্তু জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলন তাঁর চলেছিল সারাজীবন। তিনি ছিলেন একজন যথার্থ জ্ঞান-তপস্বী।

চার বছর পরে স্বদেশে ফিরলেন জগদীশচন্দ্র।

ফিরলেন তিনি ইংলণ্ডের জ্ঞান-গরিমায় বিভূষিত হয়ে।

এইবার শুরু হবে তাঁর কর্মজীবন। কিন্তু পরাধীন ভারতবর্ষে বিলাতী ডিগ্রী থাকা সত্ত্বেও তার কর্মের পথ প্রথম খুব সুগম ছিল না। কত সংগ্রাম করে তাঁকে অগ্রসর হতে হয়েছিল। দেশে ফিরবার আগে তিনি ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ ফসেট সাহেবের কাছ থেকে একখানি সুপারিশ-পত্র সংগ্রহ করেন। কলকাতায় এসে সেই চিঠি নিয়ে তিনি লর্ড রিপনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ইনি তখন ভারতের বড়লাট। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন এই কলকাতা ছিল ভারতের রাজধানী, আর বড়লাট থাকতেন আলিপুরে বেলভেডিয়ার প্রাসাদে।[১] ফসেট সাহেব বড়লাটকেই ব্যক্তিগত ভাবে ঐ চিঠিখানা লিখেছিলেন। চিঠিখানা দেখেই লর্ড রিপন তৎক্ষণাৎ জগদীশচন্দ্রকে ডেকে পাঠালেন এবং খুব আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁকে গ্রহণ করলেন।

—আমি কি করতে পারি আপনার জন্যে, বলুন?

—শিক্ষাবিভাগে যাতে একটা ভালো চাকরি পাই—

---

১ এইখানে এখন জাতীয় গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে।

—নিশ্চয়ই। আপনার তো বিশেষ যোগ্যতা রয়েছে। আমি আজই ছোটলাটকে চিঠি লিখে দিচ্ছি যাতে এখানকার সরকারী কোন কলেজে আপনাকে একটা চাকরি দেওয়া হয়।

আশ্বস্ত হয়ে ফিরলেন জগদীশচন্দ্র। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বড়লাটের সুপারিশেও বিশেষ কোন কাজ হলো না। শিক্ষাবিভাগের ইংরেজ অধিকর্তা নানা অজুহাতে জগদীশচন্দ্রের নিয়োগ সম্পর্কে অযথা দেরী করতে লাগলেন। অবশেষে প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁকে অস্থায়ী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করা হয়। চাকরি পেলেন বটে, কিন্তু ঐ পদে একজন সাহেব অধ্যাপক যে হারে মাইনে পেতেন, তাঁকে তা দেওয়া হলো না, যদিও যোগ্যতায় তিনি তাঁদের কারো চাইতে কোন অংশে কম ছিলেন না। স্বাধীনচেতা জগদীশচন্দ্র এই বৈষম্য মেনে নিতে পারলেন না। প্রতিবাদ করলেন—প্রতিবাদ শুধু আত্মসম্মানের জন্য নয়, স্বদেশের মর্যাদার জন্যও বটে। একে অস্থায়ী চাকরি, তার ওপর অর্ধেক বেতন—আত্মসম্মানে আঘাত লাগবারই কথা।

প্রতিবাদ নিষ্ফল হলো।

সরকারী নীতির কোন পরিবর্তন হলো না।

শিক্ষার ক্ষেত্রে এই বৈষম্যমূলক নীতি জগদীশচন্দ্র মেনে নিতে পারলেন না। এই অবিচার তাঁকে ক্ষুব্ধ করল। আত্মসম্মান রক্ষার উপায় কি ?—চিন্তা করলেন তিনি। পরাধীন দেশে জন্মেছেন বলেই কি প্রাপ্ত মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হবেন ? বাবার সঙ্গে পরামর্শ করলেন, পরামর্শ করলেন সতীর্থদের সঙ্গে। তারপর তিনি ঠিক করলেন মাইনে নেবেন না। চার্লস টনি তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ। তাঁর মারফৎ শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তাকে এক পত্র লিখলেন জগদীশচন্দ্র। ভারতবর্ষে কোন সরকারী কলেজে এই রকম ঘটনা সেই প্রথম।

স্মরণীয় সেই পত্রের শেষটুকু এখানে তুলে দিলাম :

'অতএব আপনি বুঝতে পারবেন যে, এই অবস্থায় আমার পক্ষে আত্মসম্মান বজায় রাখার জন্য একটিমাত্র পথই আছে—মাইনে না

নেওয়া। ইংরেজ অধ্যাপকের তুলনায় আমার যোগ্যতা যখন কম নয়, য়ুরোপের দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি যখন সর্বোচ্চ উপাধি লাভ করেছি তখন আমার নিয়োগে আমার যোগ্যতাই মানদণ্ড হওয়া উচিত, আমার বর্ণ নয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই বৈষম্যমূলক নীতি মেনে চলা আমার পক্ষে কঠিন, কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন যে কোন ভারতবাসীর পক্ষেই তা কঠিন। তবে নিয়োগপত্র যখন স্বীকার করেছি, অস্থায়ী হলেও আমি তা প্রত্যাখ্যান করব না, কিন্তু অর্ধেক মাইনে কিছুতেই গ্রহণ করতে পারব না। আমি বিনা বেতনেই কাজ চালিয়ে যাব।'

টনি সাহেব এই চিঠি পেয়ে বিস্মিত হলেন—বিস্মিত হলেন শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা। পরাধীন ভারতবর্ষের একজন অধ্যাপকের এই দৃঢ় মনোভাব তাঁদের বিস্মিত করল বটে কিন্তু তার ফলে সরকারের নীতির কোন পরিবর্তন হলো না। জগদীশচন্দ্র অর্ধেক বেতনে অস্থায়ী অধ্যাপক হয়ে রইলেন। প্রতিমাসে বেতন বাবদ একখানি করে চেক তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। সেই চেক ফেরৎ যেত। আজ এক বছর তিনি বিনা মাইনেতে চাকরি করছেন, অসুবিধা যে হচ্ছে না, তা নয়। তবে এই দুঃসময়ে তাঁর স্ত্রী অবলা বসু তাঁর স্বামীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন ত্যাগ ও ধৈর্য নিয়ে। তাই কষ্ট আর কষ্ট মনে হতো না, অভাব তিনি বুঝতেই পারতেন না।

উপযুক্ত স্ত্রীলাভ করেছিলেন জগদীশচন্দ্র। অবলা বসু ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জ্যাঠতুতো বোন। চার বছর ডাক্তারী পড়েছিলেন। বিজ্ঞানে তাঁর খুবই অনুরক্তি ছিল। এই মহীয়সী মহিলা যথার্থই বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের জীবনসঙ্গিনী ছিলেন। আজীবন তিনি তাঁর স্বামীর সুখ-দুঃখের অংশভাগিনী ছিলেন। জগদীশচন্দ্র তাঁর গবেষণার কাজ অথবা তাঁর নতুন আবিষ্কারের বার্তা নিয়ে যতবার বিদেশ গিয়েছেন, প্রত্যেক বারেই অবলা বসু তাঁর সঙ্গে ছিলেন। স্বামীর গবেষণার কাজে তাঁর সহায়তা বড়ো কম ছিল না—একথা বৈজ্ঞানিক নিজেই স্বীকার করেছেন।

তিন বছর কেটে গেল। শেষ পর্যন্ত জগদীশচন্দ্রের তেজস্বিতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার কাছে সরকারকে হার মানতে হলো।

তাঁদের নীতি পরিবর্তিত হলো। তিন বছর পরে জগদীশচন্দ্র উপযুক্ত মাইনেতে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হলেন। শুধু তাই নয়। এই তিন বছরের পুরো মাইনে তাঁকে একসঙ্গে দেওয়া হল। সেই থেকে ভারতীয় ও ইংরেজ অধ্যাপকের বেতন-বৈষম্য প্রথাও উঠে গেল। জীবনসংগ্রামে জগদীশচন্দ্রের এই প্রথম জয়লাভ। তিন বছরের সমস্ত মাইনে একসঙ্গে পেয়ে বাবার হাতে তুলে দিলেন তিনি। বললেন—এই টাকা দিয়ে আপনার দেনা শোধ করুন। কৃতী পুত্রের এই আচরণে ভগবানচন্দ্র খুব সন্তুষ্ট হলেন ও ঋণভার থেকে কিছুটা মুক্ত হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। বাকী দেনা যা ছিল তা দু'বছরের মধ্যে জগদীশচন্দ্র তাঁর মাইনের টাকা দিয়ে পরিশোধ করে বাবাকে সম্পূর্ণ ভাবে ঋণমুক্ত করেছিলেন। তাঁর পিতৃভক্তি সত্যিই অসাধারণ ছিল।

এ সময়ে জগদীশচন্দ্র কিছুদিন সস্ত্রীক চন্দননগরে হুগলী নদীর ধারে "পাতালপুরী" নামে একটি বাড়ীতে বাস করতেন। তখন অবলাদেবী তাঁর অসাধারণ ধীসম্পন্ন খেয়ালী স্বামীর যথার্থ সহধর্মিণী হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলেন। জগদীশচন্দ্র তখন প্রতিদিন চন্দননগর থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজে যাতায়াত করতেন। তাঁদের একটি "জলিবোট" ছিল। জগদীশচন্দ্র সকালে চন্দননগর থেকে জলিবোটে হুগলী নদী পার হয়ে আসতেন নৈহাটি স্টেশনে। তারপর ট্রেনে শেয়ালদহ। জীবনের এই পর্বে জগদীশচন্দ্র নানারকমের বৈজ্ঞানিক খেয়াল নিয়ে অবসর সময় কাটাতেন। অবলাদেবীও জগদীশচন্দ্রের এসব খেয়ালে অংশ নিতেন। এ প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্রের ভাগনে অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসু বলেছিলেন, "জগদীশ শিক্ষকতার জন্য ভাল বন্দোবস্ত করে দিয়ে তিনি অবসর সময়ে নিজের ও বন্ধুদের আনন্দের জন্য তাঁর বৈজ্ঞানিক খেয়ালগুলি নিয়ে কাটান—যেমন

এডিসনের নূতন আবিষ্কৃত ফনোগ্রাফে গলার সুর তুলে নেওয়া, এক্স-রে করা আর বাইরে গিয়ে ফটোগ্রাফ তুলে আনা। ছেলেবেলা থেকেই জগদীশচন্দ্র প্রাচীন ভারতের পৌরাণিক ও বৌদ্ধযুগের গল্পগুলি শুনে মুগ্ধ হতেন। দীর্ঘ অবকাশের সময় তিনি দেশের নানাস্থানে ভ্রমণে যেতেন আর সুন্দর সুন্দর প্রাচীন মন্দির ও স্তূপ খুঁজে বার করে তাদের ফটো তুলে নিতেন। তখনকার দিনে ভ্রমণে বার হওয়া খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। কোন কোন দুর্গমপথে গরুর গাড়ী, টাট্টু ঘোড়া, ডাণ্ডিতে বা কখনো হেঁটেও যেতে হত। জগদীশচন্দ্র ১০″×১২″ প্লেটের ক্যামেরা নিয়ে যেতেন আর ফটো ডেভেলাপ করা, এনলার্জ করা, প্রিন্ট করা—সব নিজে করতেন।"

অধ্যাপক বসুর কথা ছড়িয়ে পড়ল সারা ভারতবর্ষে! কলেজে তিনি প্রত্যহ চার ঘণ্টা করে পড়াতেন, তারপর ল্যাবোরেটরিতে বসে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় রত থাকতেন। এজন্য সরকার থেকে তিনি মাইনের বেশি কোন টাকা পেতেন না। নিজের খরচেই এই কাজ তিনি চালিয়ে যেতেন তপস্বীর নিষ্ঠা ও ধৈর্য নিয়ে। তাঁর চোখের সামনে ছিল ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ—যে ভারতবর্ষ বিশ্বের বিজ্ঞান-সভায় একদিন মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রেসিডেন্সি কলেজে তখন সঠিক অর্থে ল্যাবোরেটরি ছিল না, যন্ত্রপাতিও যথেষ্ট ছিল না। উপযুক্ত সহকর্মীও ছিল না। গবেষণার কাজে জগদীশচন্দ্রকে তাই অনেক রকম অসুবিধা ভোগ করতে হতো।

১৮৯৪,৩০ নভেম্বর।

জগদীশচন্দ্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে পদার্পণ করলেন। এই শুভ জন্মদিনে বিজ্ঞানের এই তরুণ সাধক পণ করলেন—'বিজ্ঞানের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করব, জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করব।' তাঁর কেবলই মনে হতো, বিশ্বের বিজ্ঞানসভায় ভারতবর্ষের স্থান কোথায়? সেদিন থেকেই তিনি তাঁর সমস্ত প্রাণমন বিজ্ঞানলক্ষ্মীর বেদীমূলে

নিবেদন করেন। এর ঠিক এক বছর আগে বাংলার আর এক সুসন্তান—স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় চিকাগো বিশ্বধর্ম সম্মেলনে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন—প্রতিষ্ঠিত করেছেন ভারতবর্ষকে বিশ্বের সেই ঐতিহাসিক ধর্ম মহাসভায়। এইবার আমরা দেখতে পাব বিশ্বের বিজ্ঞানসভায় ভারতবর্ষকে প্রতিষ্ঠিত করবেন জগদীশ-চন্দ্র বসু।
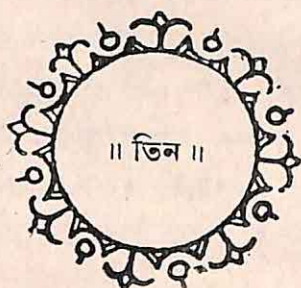
অধ্যাপনার অবসরে নিবিষ্টচিত্তে গবেষণা করে চলেছেন বিজ্ঞানী। কলেজের ল্যাবোরেটরিতে ভালো যন্ত্র নেই, যন্ত্র উদ্ভাবন করেন জগদীশচন্দ্র। দেশী কারিগর দিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে অনেক সূক্ষ্ম যন্ত্র তৈরি করিয়ে তিনি গবেষণার কাজ চালাতে লাগলেন। পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে যন্ত্রপাতি সামান্যই ছিল ; তাঁর চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে অনেক যন্ত্রপাতি বিলেত থেকে কেনা হয়। বিলেতে পড়বার সময় তিনি ইংলণ্ডের কলেজগুলির সুসজ্জিত ল্যাবোরেটরি দেখে এসেছিলেন—বিশেষ করে ডক্টর ওয়েলারের ল্যাবোরেটরিটি দেখে তিনি খুব মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর নিজের একটা ঐ রকম গবেষণাগার তৈরি করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সেটা তখনই সম্ভব হয় নি।

সংকল্পের এক বছর তখনো শেষ হয় নি। জগদীশচন্দ্র তাঁর মৌলিক গবেষণার একটি বিবরণ পাঠিয়ে দিলেন লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটিতে। বিলেতে বিজ্ঞানীদের এই প্রতিষ্ঠানটি পৃথিবীতে খুব বিখ্যাত। এই সোসাইটির স্বীকৃতি লাভ করতে না পারলে

বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে সমাদর বা সম্মান লাভ করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। এখানকার সদস্য নির্বাচিত হওয়া যে কোনো বিজ্ঞানীর পক্ষেই গৌরবের বিষয়।

সোসাইটির সভ্যগণ সেই বিবরণ পাঠ করে বিস্মিত ও চমৎকৃত হলেন। রয়্যাল সোসাইটির পত্রিকায় বিবরণটি প্রকাশিত হলো। বিশ্বের বিজ্ঞানী সমাজে পরাধীন ভারতের এক অখ্যাত অজ্ঞাত বৈজ্ঞানিকের প্রতিভা স্বীকৃতি পেলো! এই গবেষণা তিনি যাতে ঠিক মত চালিয়ে যেতে পারেন সেজন্য সোসাইটির পক্ষ থেকে জগদীশচন্দ্রকে একটা উপযুক্ত বৃত্তি দেওয়া হলো। সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানিত ডক্টর অব সায়ান্স (D.Sc.) উপাধিতে ভূষিত করলেন।

জগদীশচন্দ্রের মৌলিক গবেষণার গোড়াপত্তন হয়েছিল পুরাতন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সংস্কারের ভেতর দিয়ে। বিদ্যুৎ তরঙ্গের আবিষ্কর্তা জার্মানির অধ্যাপক হার্জ যে যন্ত্রটি উদ্ভাবন করেন তার মধ্যে অনেক ত্রুটি ছিল। জগদীশচন্দ্র নিজের অসামান্য প্রতিভাবলে সেই যন্ত্রকে সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন করে তৈরি করেন এবং তারপর নিজে ১৮৯৪ সালে একটি নতুন যন্ত্র তৈরি করেন। তাঁর এই সব কীর্তি-কলাপ যখন য়ুরোপের বিজ্ঞানী সমাজে গিয়ে পৌঁছল তখন তাঁরা এই ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন! এর জন্যেই লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ঐভাবে সম্মানিত করলেন।

জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক জীবনে দুটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে তিনি পদার্থবিদ্যা নিয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণা করতেন। পরবর্তী অধ্যায়ে তিনি গবেষণা করতেন প্রধানত উদ্ভিদবিদ্যা (Botany) নিয়ে। অব্যক্তের সন্ধানে কৃতকার্য হয়ে জড় ও প্রাণিজগতের মধ্যে মিলন-সেতু রচনা করেছিলেন; এই অব্যক্তের রহস্য উদ্ঘাটনই জগদীশ-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান। এই ক্ষেত্রে তিনি সত্যিই একেশ্বর সূর্য। এই বিষয়ে পরে বলছি।

১৮৯৫।

কলকাতা তথা সারা ভারতের প্রসিদ্ধ বিদ্বদ্‌সভা এশিয়াটিক সোসাইটিতে জগদীশচন্দ্র একটি প্রবন্ধ পাঠ করলেন। প্রবন্ধের বিষয় ছিল—'বিদ্যুৎ-উৎপাদক ইথর তরঙ্গের কম্পনের দিক পরিবর্তন।' আমরা যে কালের কথা বলছি তখন পৃথিবীতে চলছে ইলেকট্রিসিটির যুগ। য়ুরোপ ও আমেরিকায় সর্বত্রই তখন এই বিষয়ের গবেষণা চলছিল—জার্মানিতে অধ্যাপক হার্জ ছিলেন এই বিষয়ে অগ্রণী। তিনিই সর্বপ্রথম বিদ্যুৎতরঙ্গ নিয়ে কঠিন গবেষণা আরম্ভ করেন। কিন্তু যে ভারতীয় বিজ্ঞানীর গবেষণা হার্জের গবেষণাকে পরিণতির পথে নিয়ে গিয়েছিল, তিনিই জগদীশচন্দ্র বসু। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, তাঁর গবেষক জীবনের গোড়ার দিকে তিনি বৈদ্যুতিক গবেষণাতেই রত ছিলেন।

জগদীশচন্দ্র প্রবন্ধ পাঠ করলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেদিন সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট শ্রোতাদের মধ্যে কেউই সে সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করলেন না। তিনি বুঝলেন, কোন ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের প্রতিভা সম্পর্কে তারা প্রচণ্ড সন্দিহান। তারপর তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ ইংলণ্ডের 'ইলেকট্রিসিয়ান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ও-গুলি য়ুরোপের বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তারপর রয়্যাল সোসাইটির প্রশংসা তাঁকে সেদিন বিশেষভাবেই খ্যাতিমান করে তুলেছিল ওদেশে।

সাগরতরঙ্গে ভেসে এলো সেই প্রশংসার সংবাদ এদেশে। লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি জগদীশচন্দ্রের গবেষণার প্রশংসা করেছেন, তাঁরা তাঁকে বৃত্তিও দিয়েছেন—এই সংবাদ যখন ভারত সরকারের কর্ণগোচর হলো, তখন তাঁরা প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক বসুকে আর উপেক্ষা করতে পারলেন না। তার ওপর তিনি এখন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট। এমন অবস্থায় প্রতিভাবান এই বৈজ্ঞানিকের সমাদর না করলে ভালো দেখায় না। সরকারের

সুবুদ্ধি হলো ; তাঁরা নিজে থেকেই জগদীশচন্দ্রের গবেষণার জন্য বছরে আড়াই হাজার টাকা মঞ্জুর করলেন। তাঁর বিজ্ঞান-চর্চার পথ এবার একটু সুগম হলো।

তাঁর বিজ্ঞান গবেষণার পথে কোন বাধাবিঘ্নকেই জগদীশচন্দ্র কখনো স্বীকার করেন নি। 'ঘোরতর নিরাশার মধ্যেও আমি পরাজয় স্বীকার করিনি—'এ তাঁরই নিজের কথা। বিদেশে যে জয়মাল্য আহরণ করেছিলেন তা তিনি দেশলক্ষ্মীর চরণেই নিবেদন করেছিলেন। স্বদেশে যেমন, বিদেশেও তেমনি তিনি কম বাধা পান নি। সাহস আর সংকল্পের ভেতর দিয়েই তাঁকে বিজ্ঞানসাধনার পথ করে নিতে হয়েছিল।

সাঁইত্রিশ বছর বয়সে জগদীশচন্দ্র আবিষ্কার করলেন বেতার (wireless)। বিজ্ঞান জগতে নিয়ে এলেন নবযুগ। বিনা তারে সংবাদ পাঠাবার প্রথম যন্ত্র উদ্ভাবনের কৃতিত্ব তাঁরই ছিল। এখানে বলা দরকার যে, জগদীশচন্দ্র যখন এই বিষয় নিয়ে গবেষণায় রত ছিলেন তখন পৃথিবীতে আরো দু'জন বৈজ্ঞানিক বেতার নিয়ে গবেষণা করেছিলেন—জার্মানিতে হার্জ আর ইতালিতে মার্কনি। এদের মধ্যে আমাদের জগদীশচন্দ্র এই বিস্ময়কর আবিষ্কারের রহস্য সকলের আগে উদ্ঘাটন করেন। তাঁর এই আবিষ্কারের প্রমাণ তিনি কিভাবে দিয়েছিলেন, সেই কাহিনী এখানে উল্লেখ করছি।

সকলেই এই ভোজবাজী দেখে বিস্মিত হলো। কিন্তু বিজ্ঞান তো আর ম্যাজিক বা ইন্দ্রজাল নয়, এ হলো সত্য। তাই সকলের কাছে তিনি আর একবার এই সত্যের প্রমাণ রাখলেন। রাসায়নিক প্রফুল্লচন্দ্র ও বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র দু'জনেই আজীবন পরস্পরের প্রতিবেশী ছিলেন। ১৮৯৫ সালের শীতের এক বিকেলে প্রফুল্লচন্দ্রের বাড়িতে বেতার সম্পর্কে জগদীশচন্দ্র একটা পরীক্ষা দেখালেন। শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট লোক আর কয়েকটি কলেজের বিজ্ঞানের কয়েকজন অধ্যাপক এখানে উপস্থিত ছিলেন।

সভায় প্রথম বক্তৃতা করলেন ফাদার লাফোঁ। তারপর উঠলেন সৌম্যদর্শন জগদীশচন্দ্র। সম্মুখে তাঁর যন্ত্রপাতি। তারই সাহায্যে স্থললিত ভাষায় এক নতুন বৈজ্ঞানিক রহস্যের কথা তিনি বলেছিলেন। এমন আশ্চর্য কথা পৃথিবীর কেউ তখনো পর্যন্ত শোনে নি! বৈজ্ঞানিকের সারা মুখ আত্মপ্রত্যয়ে উদ্ভাসিত; তুই চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি বর্তমানকে অতিক্রম করে যেন সুদূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে! ঘরসুদ্ধ লোক শুনছে উৎকর্ণ হয়ে। তিনি যে পরীক্ষা দেখালেন তাতে সকলে চমৎকৃত হয়ে গেল। প্রফুল্লচন্দ্রের ঘরের বিদ্যুৎ তরঙ্গ রুদ্ধদ্বার ভেদ করে পাশের ঘরে গিয়ে একটা পিস্তল ছুঁড়ল। পৃথিবীতে বিনা তারে শক্তি পাঠাবার এই প্রথম সূচনা।

তারপর আর একদিন প্রেসিডেন্সি কলেজে পরীক্ষা দেখালেন। সেদিন বাংলার ছোট লাট স্যার উইলিয়াম ম্যাকেঞ্জি উপস্থিত ছিলেন। পঁচাত্তর ফিট দূরে তু'টো বন্ধ দরজার অন্তরালে রাখা একটা লোহার গোলাকে বিদ্যুতের সাহায্যে বিনা তারে নিক্ষেপ করলেন, পিস্তল আওয়াজ করলেন ও বারুদস্তূপ উড়িয়ে দিলেন। সকলেই সবিস্ময়ে দেখলো যে, এই তরুণ বৈজ্ঞানিকের উদ্ভাবিত যন্ত্র থেকে যে বিদ্যুৎ তরঙ্গ বেরুচ্ছে তাই দিয়ে এই সব কাণ্ড ঘটছে। যেন এক ভৌতিক ব্যাপার। বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উঠছে একটা ঘরে, আর সেখান থেকে পঁচাত্তর ফিট দূরে অন্য একটা ঘরের মধ্যে ঘটছে এই সব কাণ্ড, অথচ মাঝখানে তারের কোন সংযোগই নেই। এইভাবেই সেদিন, উনিশ শতকের অন্তিম প্রহরে, বেতারের মূল রহস্য সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু। এই গবেষণায় জগদীশচন্দ্র ব্যবহার করেছিলেন পাঁচ মিলিমিটার দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ। অন্য কোন বিজ্ঞানী এত ছোট মাপের তরঙ্গ সৃষ্টি করতে সফল হননি। আর এই গবেষণার সুবাদে তিনিই প্রথম আধুনিক মাইক্রোওয়েভের জন্মদাতার সম্মান লাভ করেন।

১৮৯৭ সালের জানুয়ারী মাস। জগদীশচন্দ্র প্রথম বক্তৃতা দেন বিলেতের বিখ্যাত রয়াল সোসাইটিতে। এ বক্তৃতার প্রতিক্রিয়া জানা যায় আচার্যপত্নী শ্রীমতী অবলা বসুর বর্ণনায়। তিনি লিখেছিলেন, "সভাপতির পার্শ্বে আমি বসিলাম, যে স্থানে ডেভি ও ফ্যারাডে বক্তৃতা দিতেন, সেই হলে ও সেই টেবিলে যখন এই তরুণ বাঙ্গালী বক্তৃতা দিতে দাঁড়াইলেন তখন আনন্দে আমার জীবন সার্থক মনে হইল। ভারতের জয়পতাকা আবার নূতন করিয়া বিশ্বের সম্মুখে তোলা হইল, মনে করিলাম। অন্যান্য সভার রীতির মতন এই সভাতে বক্তার পরিচয় দেওয়ার রীতি নাই। কারণ এখানে যিনি বক্তৃতা দেন তাঁহাকে সকলেই জানে। সুতরাং ঘড়িতে নয়টা বাজিবা মাত্র আচার্য বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। একঘণ্টা নীরবে সকলে বক্তৃতা শুনিলেন এবং বক্তৃতা অন্তে সকলেই আচার্যকে ঘিরিয়া অভিবাদন করিলেন। লর্ড র‍্যালে বলিলেন যে, এরূপ নির্ভুল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা কখনও হয় নাই, দু'একটি ভুল হইলে মনে হইত যেন জিনিসটা বাস্তব ; এ যেন মায়াজাল।... এই রয়্যাল ইন্স্টিটিউশনের কার্যপদ্ধতি দেখিয়া তখন হইতেই আমাদের দেশে এরূপ কোন স্থান করিবার বাসনা আমার মনেও উদয় হইল এবং বসু বিজ্ঞান মন্দিরের সূচনা ও কল্পনা তখন হইতেই আরম্ভ হইল... ।"

এতদিন পর্যন্ত বিদ্যুৎ তরঙ্গ গ্রাহক যন্ত্র হিসেবে যে সব যন্ত্রের চলন ছিল সেগুলোতে "সেমি কণ্ডাক্টি, কৃস্টাল" ব্যবহারের প্রচলন ছিল না। প্রায় সবই ছিল প্রথম আবিষ্কৃত 'কোহেরার' যন্ত্রের কম বেশি উন্নততর মডেল। জগদীশচন্দ্রই প্রথম গ্রাহক যন্ত্রে 'গ্যালেনা' নামক একধরনের উন্নততর স্ফটিক সংযোজন করলেন। এতে তৈরি হল আরও অনেক বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ তরঙ্গ গ্রাহক যন্ত্র। জগদীশচন্দ্র এর নাম দিলেন 'আলোক কোষ' বা তেজোমিটার। জগদীশচন্দ্রের পক্ষে পারিবারিক বন্ধু হিসেবে সারাকুল ও নিবেদিতা যন্ত্রটির পেটেন্ট নেন। জগদীশচন্দ্র তাঁর এই আবিষ্কারের গুণাবলী

ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ১৯০১ সালে বলেছিলেন, "এই আবিষ্কার কোহেরার তড়িৎ চাঞ্চল্য, হার্জিয়ান তরঙ্গ ও অন্যান্য বিকিরণ গ্রহণ করিয়া তার প্রকাশ ও নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পরবর্তীকালে বিখ্যাত বিজ্ঞানী ব্রুনো লাঙ্গে তাঁর "ফটোএলিমেণ্ট" গ্রন্থে জগদীশচন্দ্রের এই কাজের মূল্যায়ন করতে গিয়ে লিখেছিলেন, "গ্যালেনা, টেলুরিয়াম এবং অন্যান্য খনিজ নির্দেশকের আবিষ্কার হয়েছিল সুদূর পূর্বপ্রাচ্য কলকাতায়। আবিষ্কারক জগদীশচন্দ্র বসু, ভারতীয় পদার্থবিদ এই আবিষ্কারের উপযোগিতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন। তাই বসু তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্রটিকে একটি কৃত্রিম চোখের সঙ্গে তুলনা করেন।" কিন্তু দুঃখের বিষয় জগদীশচন্দ্রের এই আবিষ্কারের পেটেণ্টের সময়সীমা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। তাছাড়া এবিষয়ে তাঁর প্রচারও যথেষ্ট ছিল না, তাই গোটা আবিষ্কারটি আবার পুনঃ আবিষ্কৃত হয় ১৯১৭ সালে।

বৈদ্যুতিক বা ইথর তরঙ্গ ধরবার জন্য জগদীশচন্দ্র যে যন্ত্রটি উদ্ভাবন করেছিলেন তার চূড়ান্ত পরীক্ষা তিনি সেদিন য়ুরোপের একাধিক বৈজ্ঞানিক-সভায় প্রদর্শন করেন। অদৃশ্য আলোক বা বিদ্যুৎ তরঙ্গ উৎপাদন করে তার অস্তিত্ব প্রমাণের উপায়টি প্রত্যক্ষ করিয়ে সেদিন পাশ্চাত্য জগতকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করে দিয়েছিলেন। তখন বিলেতের দু-দুটো খুব নামকরা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিকদের কাছ থেকে প্রস্তাব এলো জগদীশচন্দ্রের কাছে তাঁর এই মূল্যবান আবিষ্কার কিনে নেবার জন্য। তাঁরা এজন্য তাঁকে প্রচুর টাকাও দিতে চেয়েছিলেন। নির্লোভ বৈজ্ঞানিক এই প্রস্তাবে কিছুতেই রাজী হন নি। এই সময়ে তিনি বলেছিলেন—'একবার যদি টাকার দিকে আকৃষ্ট হই তাহলে বিজ্ঞানের সাধনায় আর কিছুই করতে পারব না।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইচ্ছে করলে জগদীশচন্দ্র সেদিন তাঁর উদ্ভাবিত

বেতারযন্ত্র তৈরির কৌশল বিক্রি করে কোটিপতি হতে পারতেন। অথচ আজ পৃথিবীর লোক ঐ যন্ত্র কাজে লাগিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করছে। তাঁরই উদ্ভাবিত 'ক্রিস্টাল সেট' আজো বেতার যন্ত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিজ্ঞানের সাধনা আর বাণিজ্যের লাভালাভ এক বিষয় নয়—এই মহৎ আদর্শকে সামনে রেখেই তো সেদিন যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তা দেখে ইংলণ্ডের অনেক বিজ্ঞানী কম বিস্মিত হন নি। জ্ঞান দেবতার দান, অর্থলাভের উপায় নয়—এই আদর্শের পূজারী ছিলেন বিজ্ঞানসাধক জগদীশচন্দ্র। যে আবিষ্ক্রিয়ার উদ্ভাবক ছিলেন তিনি, তাঁর কৃতিত্ব নিয়ে নামযশ পেলেন মার্কনি। নির্লোভ জগদীশচন্দ্র সংযত সাধকের মতো জ্ঞানরাজ্যের দরজা খুলে একপাশে নীরবে সরে দাঁড়ালেন। নব নব জ্ঞানের ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়তে লাগল তাঁর নব নব গবেষণা।

য়ুরোপে বাঙালী বৈজ্ঞানিকের এই দিগ্বিজয়ের কাহিনী স্মরণীয় হয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের একটি অনুপম কবিতায়। বিশ্বের বিজ্ঞানী সমাজে জগদীশচন্দ্রের এই সাফল্য লাভে গর্ব ও আনন্দবোধ করে সেদিন কবি লিখেছেন—

বিজ্ঞানলক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম-মন্দিরে
দূর সিন্ধু তীরে
হে বন্ধু গিয়েছ তুমি ; জয়মাল্যখানি
সেথা হতে আনি
দীনা হীনা জননীর লজ্জানত শিরে
পরায়েছ ধীরে॥

যশের মুকুট মাথায় নিয়ে স্বদেশে ফিরলেন জগদীশচন্দ্র। নিবিড় ভাবে নিযুক্ত হলেন গবেষণায়। কিন্তু সবচেয়ে বড় অভাব ছিল যন্ত্রপাতিতে পরিপূর্ণ একটা ল্যাবোরেটরির। রয়্যাল ইনস্টিটিউটের ল্যাবোরেটরির মতো একটা ল্যাবোরেটরি হলে তাঁর গবেষণা কাজের খুব সুবিধা হয়, নতুবা প্রেসিডেন্সি কলেজের কয়েকটি ভাঙা টেস্ট-টিউব নিয়ে সত্যিকারের গবেষণা চলতে পারে না—এইসব কথা জানিয়ে জগদীশচন্দ্র বড়লাট লর্ড এলগিনকে একখানি চিঠি লিখলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন ফল হলো না, যদিও বড়লাট সহানুভূতি জানিয়েছিলেন ও মৌখিক প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন।

এ সময়ে ভারত ভ্রমণে এলেন ভগিনী নিবেদিতা ও মিসেস ওলে বুল। কারণ ভারতবর্ষ স্বামী বিবেকানন্দের দেশ। একদিন তাঁরা কৌতূহলী হয়ে গেলেন জগদীশচন্দ্রের প্রেসিডেন্সি কলেজের গবেষণাগারে। জগদীশচন্দ্রের কাজে নানা বাধা বিপত্তি দেখে তাঁরা কষ্ট পেলেন। এরপর নিবেদিতা স্বদেশ (আয়ারল্যাণ্ড) ছেড়ে পাকাপাকি ভাবে চলে আসেন ভারতবর্ষে। নারীশিক্ষা, জনকল্যাণমূলক নানা কাজে ও স্বদেশী আন্দোলনে তিনি নিজেকে

উৎসর্গ করেন। আচার্য পত্নী অবলাদেবীও ছিলেন আমাদের দেশে নারীশিক্ষার একজন পথিকৃত। বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর বসু পরিবারের সঙ্গে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। জগদীশচন্দ্রের অসীম সঙ্কল্প ও বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করার দৃপ্ত মানসিকতা নিবেদিতাকে বিশেষ-ভাবে আকৃষ্ট করে। ১৯১১ সালে তিনি মারা যান। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি জগদীশচন্দ্রকে নানাভাবে উৎসাহিত করেন।

১৮৯৯ সাল। বিদ্যুৎ তরঙ্গ গ্রাহক যন্ত্রে স্ফটিক ব্যবহার করে নানা ধরনের গবেষণার কাজ শুরু করলেন জগদীশচন্দ্র। এই গবেষণার সুবাদে জগদীশচন্দ্র আবিষ্কার করলেন আজকের যুগান্তকারী ক্রস্টাল রেকটিফায়ার ও ফটো ভলটায়িক সেল।

এ সময়ই এই বিদ্যুৎ তরঙ্গ গ্রাহক যন্ত্র সম্পর্কিত গবেষণা জগদীশচন্দ্রকে সম্পূর্ণ নূতন এক গবেষণারাজ্যে টেনে নিয়ে গেল। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "তখন তারহীন সংবাদ ধরিবার কল নির্মাণ করিয়া পরীক্ষা করিতেছিলাম। দেখিলাম, হঠাৎ কলের সাড়া কোনও অজ্ঞাত কারণে বন্ধ হইয়া গেল। মানুষের লেখাভঙ্গী হইতে তাহার শারীরিক দুর্বলতা ও ক্লান্তি যেরূপ অনুমান করা যায়, কলের সাড়া লিপিতে সেই একইরূপ চিহ্ন দেখিলাম। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বিশ্রামের পর কলের ক্লান্তি দূর হইল এবং পুনরায় সাড়া দিতে লাগিল। উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগে তাহার সাড়া দেবার শক্তি বাড়িয়া গেল এবং বিষ প্রয়োগে তাহার সাড়া একেবারে অন্তর্হিত হইল।"

আশ্চর্য উপলব্ধি। জগদীশচন্দ্র বারবার পরীক্ষা করে দেখলেন। ভালো করে যাচাই করলেন নিজস্ব পরীক্ষালব্ধ ফলাফল। অল্প দিনের মধ্যেই খবর এলো প্যারিস শহরে অনুষ্ঠিত হবে পদার্থবিদ্যার ওপর এক আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান আলোচনা চক্র। তিনি ঠিক করলেন নিজের এই উপলব্ধির কথা জানানো হবে বিশ্ববাসীকে। আমন্ত্রণপত্রও এসে গেল। কিন্তু পরাধীন দেশের নাগরিক

জগদীশচন্দ্রের পক্ষে আমন্ত্রিত হওয়া আর যেখানে গিয়ে বক্তৃতা দেওয়া, এই দু'য়ের প্রভেদ অনেক। অনেক চেষ্টার পর জগদীশচন্দ্র ভারত সরকারের কাছ থেকে অনুমতি পেলেন।

জগদীশচন্দ্র তাঁর বক্তৃতায় জড়পদার্থের সাড়াকে ভৌত রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করলেন। বক্তৃতার প্রতিক্রিয়া হ'ল মিশ্র। সম্ভবত, সেইদিন থেকেই শুরু। জগদীশচন্দ্র অজান্তে পা বাড়ালেন অজানা বন্ধুর পথে। তাই সেদিন সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। সুসঙ্গত সমালোচনায় মৌলিক গবেষণার কাজ দ্রুত এগিয়ে যায় সন্দেহ নেই। কিন্তু জগদীশচন্দ্রকে যে ধরনের সমালোচনার সামনে পড়তে হয়েছিল তা স্বাভাবিক ছিল না। কারণ জগদীশচন্দ্রের জড় পদার্থের সাড়া বিষয়ক মতবাদ ছিল ইয়োরোপীয় প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের মতবাদের পরিপন্থী। আর তাছাড়া বিজ্ঞান গবেষণার ব্যাপারে নূতন দিগন্তের কথা শুনতে হবে একজন ভারতীয়ের মুখে—এ কেমন কথা।

কিন্তু প্যারিস সম্মেলনে শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর নিজস্ব প্রতিক্রিয়ার কথা তিনি লিখে গেছেন "পরিব্রাজক" গ্রন্থে। তিনি লিখেছিলেন, আজ ২৩শে অক্টোবর কাল সন্ধ্যার সময় প্যারিস হ'তে বিদায়। এ বৎসর এ প্যারিস সভ্য জগতে এক কেন্দ্র, এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী। নানা দিগদেশ সজ্জনসঙ্গম। দেশ দেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করছেন আজ এ প্যারিসে।

এ মহাকেন্দ্রের ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদতরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্বজন সমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি – এ জার্মান ফরাসী ইতালী প্রভৃতি বুধমণ্ডলীমণ্ডিত মহারাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌববর্ণ প্রতিভামণ্ডলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির—আমাদের

মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন, সে বীর জগৎ প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডঃ জে. সি বোস…"।

এরপর জগদীশচন্দ্র লণ্ডনে এলেন। জড় পদার্থের সাড়া বিষয়ক সমস্যাটি পদার্থবিদ হিসেবে গভীরভাবে চিন্তা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু চিন্তার সঙ্গে কাজের যথার্থ সংযোগ ঘটলো না। অসুস্থ হলেন তরুণ বিজ্ঞানী। একাকী রয়েছেন উইমেলভনের একটি বাড়িতে। বিছানায় শায়িত। দূরে লণ্ডনের ঘোলাটে আকাশ। আকাশের পটভূমিতে একটি বড় গাছ। একদিন গাছটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জগদীশচন্দ্রের হঠাৎ মনে হলো, এই তো কয়েকদিন আগে প্যারিসে দেখিয়ে এসেছেন জড় পদার্থের বৈদ্যুতিক সাড়া। তবে কেন এই গাছটির ভেতর এ ধরনের কোন সাড়া দেখতে পাওয়া যাবে না। মনে হলো স্পর্শকাতর দু'চারটি গাছ ছাড়া অন্য গাছের কোন উত্তেজনার অনুভূতি নেই—এ সব ধারণা ঠিক নাও হতে পারে।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই জগদীশচন্দ্র ব্যক্তিগতভাবে দেখা করলেন বিলেতের তদানীন্তন সর্বপ্রধান জীবতত্ত্ববিদ্ স্যার বার্ডন সেণ্ডারসনের সঙ্গে। জগদীশচন্দ্র নিজের নূতন উপলব্ধির কথা তুলে ধরলেন। অনুরোধ জানিয়ে বললেন, আপনারা এবিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা করুন। কিন্তু এ অনুরোধের ফল হলো বিপরীত। সেণ্ডারসন সাহেব খানিকটা বিরক্ত হয়ে বললেন, "জীবন তত্ত্ব সম্বন্ধে আপনি যা বলছেন, সে সম্বন্ধে আমাদের চেষ্টা আগে নিষ্ফল হয়েছে ; তাই আপনার কথা অসম্ভব ও অগ্রাহ্য ; এশাস্ত্রে আপনার অনধিকারচর্চা হয়েছে। আপনি পদার্থ বিজ্ঞানের পথে যশস্বী হয়েছেন। আপনার সামনে সেই প্রশস্ত পথে বহু কৃতিত্ব অপেক্ষা করছে। আপনার অজানা পথ থেকে আপনি নিবৃত্ত হোন।' এরপর একটু থেমে সেণ্ডারসন সাহেব আবার বললেন, "আমি উদ্ভিদ সম্বন্ধে সমস্ত জীবন অনুসন্ধান করেছি। কেবল লজ্জাবতী গাছ সাড়া দেয়।"

জগদীশচন্দ্র বাউন সেণ্ডারসনের সাবধানবাণীর পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলেন, "তখন কুমতির প্ররোচনায় বলিলাম, নিবৃত্ত হইব না। এই বন্ধুর পথই আমার। আজ হইতে সোজা পথ ছাড়িলাম। আজ যাহা প্রত্যাখ্যাত হইল তাহাই সত্য ; ইচ্ছাতেই হউক অনিচ্ছাতেই হউক তাহা সকলকে গ্রহণ করিতেই হইবে।"

সেদিন এই ভারতীয় বিজ্ঞানীকে তাঁর আবিষ্ক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য জগদীশচন্দ্রকে কি প্রবল বাধা ও সংকটের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছিল, সে ইতিহাস জানবার মতো। একদিকে দারুণ অর্থাভাব, অন্যদিকে শারীরিক অসুস্থতা, তার ওপর বিজ্ঞানীদের বিরোধিতা—এরই মধ্যে অটল ধৈর্য আর আশ্চর্য মনোবল নিয়ে জগদীশচন্দ্রকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। এই সংগ্রামের আর একটা ঘটনা বলি।

লণ্ডনের ব্রিটিশ এসোসিয়েশন থেকে তাঁকে একদিন বক্তৃতা দেবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হল। সেদিন স্যর অলিভার লজ জগদীশচন্দ্রের থিওরির প্রতিবাদ করবেন বলে বদ্ধপরিকর হয়ে এসেছেন। সঙ্গে আছেন তাঁর কয়েকজন তরুণ বন্ধু—সকলেই বৈজ্ঞানিক। অন্যদিকে জগদীশচন্দ্র একা। তাঁর থিওরি বোঝাতে কম করে তিন ঘণ্টা সময় দরকার, অথচ তাঁকে সময় দেওয়া হলো মাত্র পনের মিনিট। কিন্তু অসাধ্য সাধনই করলেন সেদিন জগদীশচন্দ্র। পনর মিনিটের মধ্যেই তিনি অকাট্য প্রমাণের সঙ্গে বুঝিয়ে দিলেন তাঁর আবিষ্কৃত সত্যের মর্মকথা। তুমুল প্রশংসাধ্বনির মধ্যে বক্তৃতা শেষ করলেন তিনি। তখন লজ উঠে দাঁড়ালেন। তখন বিরোধী দলের সবাই লজ কি বলেন তা-ই শোনবার জন্য উৎকর্ণ হলো। জগদীশচন্দ্র অবিচলিত। লজ বললেন—না, প্রতিবাদ করবার কিছুই নেই। তারপর বসু-জায়ার কাছে গিয়ে সেই পক্ককেশ বৈজ্ঞানিক বললেন—আপনার স্বামীর বিস্ময়কর আবিষ্ক্রিয়া সম্পর্কে আমার আন্তরিক অভিবাদন গ্রহণ করুন।

এখানে একটা বিষয়ের উল্লেখ করা দরকার। এইবার য়ুরোপে এসে জগদীশচন্দ্র নিজের কাজ ছাড়া আরো একটা বড়ো কাজ করেছিলেন। কেমন করে রবীন্দ্র-প্রতিভাকে তিনি য়ুরোপের বিদগ্ধ সমাজে তুলে ধরবেন, সেজন্য বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। ১৯০০ সালের ২ নভেম্বর এক চিঠিতে তিনি কবিকে লিখছেন[১]—'তুমি পল্লীগ্রামে, লুক্কায়িত থাকিবে, তাহা আমি হইতে দিব না। তোমার গল্পগুলি আমি এদেশে প্রকাশ করিব।...তুমি সার্বভৌমিক। তোমাকে যশোমণ্ডিত দেখতে চাই।' এই সময়ে জগদীশচন্দ্র বন্ধুর ছুটি গল্পটি ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়ে লণ্ডনের একটি বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশ করেন। কবির নিজের কিন্তু তখনো পর্যন্ত তাঁর রচনার ভাষান্তর বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ ছিল না। তিনি তাঁর রচনা-লক্ষ্মীকে জগৎ সমক্ষে বের করতে তখনো কুণ্ঠিত ছিলেন। জগদীশচন্দ্রই তাঁর সেই কুণ্ঠা ভেঙে দিয়েছিলেন।

---

১ তখন রবীন্দ্রনাথ বেশির ভাগ সময় পদ্মাতীরে শিলাইদহ গ্রামে থাকতেন ও তাঁদের জমিদারি দেখাশুনা করতেন। অবসর সময়ে সাহিত্য চর্চা করতেন। অনেকগুলি গল্প তিনি এইখানে লিখেছিলেন। জগদীশচন্দ্র কখনো কখনো এখানে এসে বন্ধুকে তাঁর সাহচর্য দিতেন।
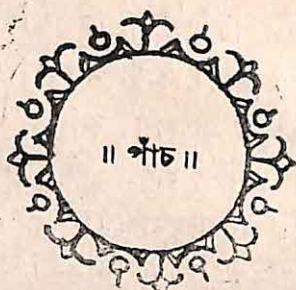
১৯০১। ১০ মে।

লণ্ডনের রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা দেবেন। বক্তৃতার বিষয়—যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক তাড়নার জন্য জড়পদার্থের সাড়া। বক্তৃতামঞ্চে জগদীশচন্দ্র, টেবিলের ওপর তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্র। গ্যালারিতে বিপুল লোক সমাগম হয়েছে—তাদের বেশির ভাগই বৈজ্ঞানিক। সেদিনের সেই স্মরণীয় সভায় বাংলা তথা ভারতের আর একজন সুসন্তান উপস্থিত ছিলেন। তিনি রমেশচন্দ্র দত্ত।

বন্ধুর এই বিজয়গৌরবের সংবাদে উল্লসিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনে একটি প্রবন্ধ লিখলেন—'জগদীশচন্দ্রের জয়বার্তা।' বিদেশে বন্ধুর দিগ্বিজয়ের পথ যাতে সুগম হয়, এই ছিল এখানে কবির সর্বক্ষণের চিন্তা ও চেষ্টা। বিদেশে বন্ধুর বিজ্ঞানসাধনা অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত থাক, এই ছিল সেদিন রবীন্দ্রনাথের একান্ত কামনা।

বিদেশে নতুন সাফল্যের ফলে একদিকে যেমন উদ্যম উদ্দীপনার উচ্চ শিখরে জগদীশচন্দ্রের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা উন্নীত হয়েছিল, অন্য দিকে তেমনি টাকার অভাবে তাঁর দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না।

বন্ধুকে এক চিঠিতে তিনি লিখলেন যে, তাদের কাজের জন্য অসীম পরিশ্রম ও অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন। ইংলণ্ডে থেকে গবেষণা ও অধ্যাপনা করার সুযোগ-সুবিধা আছে, এমন কি এজন্য কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমন্ত্রণও তিনি পেয়েছেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই মাতৃভূমির আকর্ষণ ছিন্ন করতে পারেন না। জগদীশচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমের এর চেয়ে বড়ো পরিচয় আর কিছু নেই। বিদেশে তিনি কোন চাকরি নিতে পারলেন না। অথচ ছুটিও ফুরিয়ে আসছে ; পুঁজিও শেষ হয়ে এলো। কিন্তু গবেষণা তখনো শেষ হয় নি। গবেষণা শেষ করতে হলে আরো ছুটি দরকার। কিন্তু ছুটি পেলেন না। অগত্যা তিনি অর্ধেক মাইনেতে ছুটি চাইলেন।

জগদীশচন্দ্রের এই বিপদের কথা শুনলেন রমেশচন্দ্র দত্ত। বিচলিত হয়ে তিনি কলকাতায় রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখলেন। জগদীশচন্দ্রও এক দীর্ঘ চিঠিতে তাঁর অবস্থা জানিয়ে কবিকে লিখলেন—'বন্ধু, নানা কারণে আমার মন ম্রিয়মাণ, ছুটি আর বৃদ্ধি হলো না। ফার্লোর জন্য দরখাস্ত করেছি। তাও পাই কিনা সন্দেহ। এমন অবস্থায় কাজ ফেলে গেলে আবার যে খেই ধরতে পারব, সে আশা হয় না। আমার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে যে সব আলোক-রেখা দেখছি, তা একবার মুছে গেলে আর কখনো পাব না। জার্মানি ও আমেরিকায় যাওয়া বিশেষ দরকার ছিল, তা কি করে হবে জানি না।'

এই চিঠি পেয়ে রবীন্দ্রনাথ খুবই বিচলিত বোধ করলেন। বুঝলেন সরকার তাঁর জন্য কিছুই করবে না! আরো বুঝলেন—জগদীশচন্দ্রের এই বিপদে দেশের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে চলেছে। ভারত-বর্ষকে বিশ্বের সামনে বড় করে তুলবার এই যে সুযোগ—এ আর শীঘ্র আসবে না। তিনি বন্ধুর জন্য কি করা যায়, তা চিন্তা করলেন। টাকার অভাবে জগদীশচন্দ্রের সাধনা যাতে ব্যাহত না হয়, তাঁর

মহাব্রত অর্ধপথে অসমাপ্ত রেখেই যাতে তিনি দেশে ফিরে আসতে বাধ্য না হন, সেজন্য কবি ভিক্ষাপাত্র হাতে তুলে নিলেন। বন্ধুকে উৎসাহ দিয়ে, আশ্বাস দিয়ে লিখলেন—'তুমি তোমার তপস্যা শেষ কর। দৈত্যের সহিত লড়াই করিয়া অশোক বন হইতে সীতা-উদ্ধার তুমিই করিবে, আমি যদি কিঞ্চিৎ টাকা আহরণ করিয়া সেতু বাঁধিয়া দিতে পারি তবে আমিও ফাঁকি দিয়া স্বদেশের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিব।'

ত্রিপুরার রাজ-পরিবারের সঙ্গে কবির বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিদেশে বন্ধুর এই দুর্দিনে তাঁদের কথাই তাঁর মনে পড়ল। ত্রিপুরার মহারাজা ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববর্মাকে তিনি একখানা চিঠি লিখলেন এবং তারপর জগদীশচন্দ্রের জন্য দরবার করতে কবি এলেন আগরতলায়। মহারাজা তাঁর হাতে তুলে দিলেন পনর হাজার টাকার একখানা চেক। রবীন্দ্রনাথ সেই টাকা তৎক্ষণাৎ প্রবাসী বৈজ্ঞানিককে পাঠিয়ে দিলেন। সেই টাকা পেয়ে জগদীশচন্দ্রের দুর্ভাবনার বোঝা যে হাল্কা হয়ে গিয়েছিল তা বলাই বাহুল্য।

বন্ধুর গৌরবে তিনি যে কি পরম গৌরব অনুভব করতেন, তার অনেক নিদর্শন আছে গদ্যে ও পদ্যে। এই বছরেই (১৯০১) বঙ্গদর্শনে জগদীশচন্দ্রের জয়বার্তা ঘোষণা করে, রবীন্দ্রনাথ এই সুন্দর বন্দনা কবিতাটি লিখেছিলেন—

> হে তপস্বী, ডাক তুমি সামমন্ত্রে জলদগর্জনে
> 'উত্তিষ্ঠত! নিবোধত!' ডাক শাস্ত্র-অভিমানী জনে
> পাণ্ডিত্যের পণ্ডতর্ক হতে। সুবৃহৎ বিশ্বতলে
> ডাক মূঢ় দাম্ভিকেরে! ডাক দাও তব শিষ্যদলে—
> একত্রে দাঁড়াক তারা তব হোম-পূতাগ্নি ঘিরিয়া।
> আর বার এ ভারত আপনাতে আসুক ফিরিয়া
> নিষ্ঠায়, শ্রদ্ধায়, ধ্যানে—বসুক সে অপ্রমত্ত চিতে
> লোভহীন দ্বন্দ্বহীন শুদ্ধ শান্ত গুরুর বেদীতে।

দূর সিন্ধুপারে, পাশ্চাত্য দেশে জগদীশচন্দ্র নব্য ভারতের প্রথম ঋষিরূপে জ্ঞানের আলোকশিখায় নতুন হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করবেন, তাঁর সাধনায় ভারতবর্ষ আবার গুরুর বেদীতে আরোহণ করবে—এই চিন্তা-ভাবনা এই সময়ে কবির মনকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করেছিল। তাই বন্ধুর জয়বার্তা ঘোষণায় তাঁর উৎসাহের শেষ ছিল না।

এই অপরিসীম ও আন্তরিক উৎসাহ সাগরপারে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বৈজ্ঞানিকের মনে কি রকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তার পরিচয় পাই এই সময়ে বন্ধুকে লেখা জগদীশচন্দ্রের দু'খানি চিঠিতে। প্রথম চিঠিতে লিখেছেন—'তোমার পত্র ও কবিতা পাইয়া আমি কিরূপ উৎসাহিত হইয়াছি, তাহা জানাইতে পারি না···তোমার স্বরে আমি ক্ষীণ মাতৃস্বর শুনিতে পাই—সেই জন্মভূমি ব্যতীত আমার আর কি উপাস্য আছে? তোমাদের স্নেহে আমার অবসন্নতা চলিয়া যায়, তোমরা আমার উৎসাহে উৎসাহিত, তোমাদের বলে আমি বলীয়ান। তোমাদের আশাতে আমি আশান্বিত।' দ্বিতীয় চিঠিখানি আরো সুন্দর—'গাছ মাটি হইতে রস শোষণ করিয়া থাকে, উত্তাপ ও আলো পাইয়া পুষ্পিত হয়। কাহার গুণে প্রস্ফুটিত হইল?—কেবল গাছের গুণে নয়। আমার মাতৃভূমির রসে আমি জীবিত, আমার স্বজাতির প্রেমালোকে আমি প্রস্ফুটিত।...আমি শত বাধা পাইয়াও ভগ্নোদ্যম হইব না এবং তোমাদের জন্য জয়লাভ করিব।'

এই-ই জগদীশচন্দ্র বসু। স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, সংকল্পে স্থির এবং সংগ্রামে অজেয়। সত্যই তিনি বিজ্ঞানজগতের একজন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ছিলেন। সেদিন যে যশের মালা তাঁর গলায় অর্পিত হয়েছিল, তিনি সেই মালা তাঁর স্বদেশ জননীর চরণে অর্পণ করেছিলেন শ্রদ্ধার সঙ্গে।

১৯০২ সালের অগস্ট মাসে জগদীশচন্দ্র যশের মালা মাথায় নিয়ে স্বদেশে ফিরলেন। পেছনে রেখে এলেন এক আদর্শবাদী

বৈজ্ঞানিকের নির্লোভ ত্যাগের দৃষ্টান্ত যা দেখে ওদেশের বিজ্ঞানীরা বিস্মিত হয়েছিলেন! কিন্তু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে অর্থের জন্য মূলধন রূপে ব্যবহার করতে অস্বীকার করে ভারতের বৈজ্ঞানিক সেদিন য়ুরোপের বিজ্ঞানীদের সামনে যে আদর্শ টা তুলে ধরতে চেয়েছিলেন তার মহত্ত্ব সেদিন তাঁরা সহজে উপলব্ধি করতে পারেন নি। অর্থলোভী য়ুরোপকে জগদীশচন্দ্র এই শিক্ষা দিয়ে এসেছিলেন যে, বিজ্ঞানের সম্পদ কারো একচেটিয়া সম্পত্তি নয়, এ জিনিস বিশ্বমানবের সম্পদ, মানব-জাতির কল্যাণ সাধনেই এর প্রকৃত সার্থকতা।

দেশজননীর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে বিজ্ঞানলক্ষ্মীর বরপুত্র জগদীশচন্দ্র দেশে ফিরলেন। সেদিন তাঁর সংবর্ধনার জন্য দেশবাসী যে আয়োজন করেছিলেন তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও মিশিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর অন্তরের অভিনন্দন। সেদিন কবি বন্ধুর উদ্দেশে রচিত সংবর্ধনা সংগীতে বললেন—

জয় তব হোক জয়।
অবারিত গতি তব জয়রথ
ফিরে যেন আজি সকল জগৎ
দুঃখ দীনতা যা আছে মোদের
তোমারে বাঁধি না রয়।
জয় তব হোক জয়॥

জগদীশচন্দ্র যখন দেশে ফিরলেন, কবি তখন পদ্মার তীরে শিলাইদহে। পদ্মার সেই নির্জন তীর থেকেই তিনি বন্ধুকে জানালেন সাদর নিমন্ত্রণ। বিজ্ঞানী এলেন শিলাইদহে। পদ্মার তীরে মনোরম কুঠি-বাড়ি ও চারদিকের শান্ত পরিবেশ দেখে জগদীশচন্দ্র মুগ্ধ হলেন। কবির সঙ্গে কিছুদিন সুখে কাটালেন তিনি এখানে। যে কয়দিন তিনি ছিলেন সেই কয়দিন রবীন্দ্রনাথ একটি করে গল্প লিখে, সন্ধ্যা বেলায় বন্ধুকে পড়ে শোনাতেন। এখানে একটা কথা

বলে রাখা ভালো। রবীন্দ্রনাথের কবিতার চেয়ে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পই তাঁর বিজ্ঞানী বন্ধুটির কাছে বেশি প্রিয় ছিল। জগদীশচন্দ্র সত্যিই রবীন্দ্রসাহিত্যের একজন সত্যিকার সহৃদয় পাঠক ও বোদ্ধা ছিলেন।

*　　*　　*　　*

এবার জগদীশচন্দ্র কাজ শুরু করলেন। বৃক্ষজগতের সীমাহীন সমস্যার মধ্যে তিনি ডুব দিলেন। উদ্ভিদের শরীরচর্চার জন্য তখন যে ধরনের যন্ত্রের চলন ছিল, তিনি সেগুলোকে দরকার মত পাল্টালেন। অদলবদল করলেন। সুবিধে হলো না। অনুভব করলেন উদ্ভিদ সম্পর্কে সঠিক কিছু জানতে গেলে দরকার সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি। উপযুক্ত যন্ত্র তৈরির অক্ষমতাই উদ্ভিদ সম্পর্কে মনগড়া মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। সামান্য উপকরণকে কাজে লাগিয়ে সূক্ষ্ম কাজের উপযোগী অথচ সরল যন্ত্র নির্মাণে তিনি ছিলেন বিরল প্রতিভার অধিকারী। সে সময় আচার্যদেবের অর্থবল ছিল না। ছিল না উপযুক্ত যন্ত্রাগার ও যন্ত্রী। যা অসম্ভব তা তিনি সম্ভব করেছিলেন নিজস্ব একটি বিশ্বাস ও সহজাত বিরল উদ্ভাবনী শক্তিকে কেন্দ্র করে। মালেক, পুঁটিরাম, বারিক, রজনীকান্তের মত আরো কয়েকজন "অল্প শিক্ষিত" কারিগরকে শিখিয়ে নিয়ে তাদের দিয়ে যে বিরাট কিছু করা যায়— এ বিশ্বাসের কারণ জানতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে সেই ১৮৯৭ সালের গোড়ায়। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রয়োগশালায় বসে কাজ করছেন জগদীশচন্দ্র। হঠাৎ একটি লোক ঢুকল ঘরে। জীর্ণ বেশবাস। মাস দুয়েক আগে লোকটি বেয়ারারের কাজ করতো কলেজে। অপদার্থতার অভিযোগে চাকুরীটি খুইয়েছে। নাম নানক। পুনরায় সে কর্মপ্রার্থী। শীর্ণ মুখমণ্ডলের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে আবার তাকে কাজে বহাল করলেন জগদীশচন্দ্র। বছর দুই বাদে একদিন জগদীশচন্দ্রের একটি ডায়নামো খারাপ হলো। গবেষণার প্রয়োজনে দরকার তক্ষুনি যন্ত্রটিকে সারানো। দেখা গেল

যন্ত্রের ভারপ্রাপ্ত বৃটিশ ইঞ্জিনীয়ার হঠাৎ মারা গেছেন। চিন্তাগ্রস্ত জগদীশচন্দ্র বসে আছেন নিজস্ব কামরায়। দরজা ঠেলে ঢুকল সেই নানক। দৃঢ়তার সঙ্গে সে যন্ত্রটি সারাবার অনুমতি চাইল। বলিষ্ঠ বাচনভঙ্গিতে বিস্মিত দ্বিধাগ্রস্ত জগদীশচন্দ্র অনুমতি দিলেন। মাত্র ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ঠিক হয়ে গেল জটিল যন্ত্রটি। মুগ্ধ জগদীশচন্দ্র মানুষের কর্মক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলো।

উদ্ভিদ গবেষণার শুরুতে প্রথমে ফটোগ্রাফি ও অপটিক্যাল লিভার ব্যবস্থায় কিছু পরীক্ষা চালালেন। কিন্তু দেখলেন এ ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। চাই আরও নিখুঁত যন্ত্র। প্রয়োজনের সঙ্গে তালে তাল রেখে যন্ত্রের ক্রমবিকাশ শুরু হলো। তৈরি হতে লাগল একের পর এক স্বয়ংলেখ যন্ত্র।

উদ্ভিদ আর প্রাণীর সাড়ার মধ্যে কতটা মিল আছে—এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই তাঁর উদ্ভিদতাত্ত্বিক গবেষণার শুরুতেই স্পর্শ-কাতর গাছগুলোই তাঁর কাছে প্রথম দিকে প্রাধান্য পেল। সেই উপযোগী যন্ত্রও। উত্তেজনায় গাছ কিরকম সঙ্কুচিত হয় তা মাপার জন্য "কুঞ্চন গ্রাফ" যন্ত্র আবিষ্কার করেন।

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের নাম সাধারণত গ্রীক বা ল্যাটিন শব্দ থেকে বেছে নেওয়ার রীতি। কিন্তু জগদীশচন্দ্র যন্ত্রের নামকরণ করে-ছিলেন মাতৃভাষায়। পরে অবশ্য বাধ্য হয়েই তিনি পরবর্তী যন্ত্রগুলোর নামকরণ করেছিলেন ইংরেজী বা ল্যাটিনে। এ বিষয়ে জগদীশচন্দ্রের বর্ণনা বড় উপভোগ্য। "ক্রেস্কোগ্রাফ" যন্ত্রের নাম-করণ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ইচ্ছা ছিল কলের নাম 'ক্রেস্কোগ্রাফ' না রাখিয়া 'বৃদ্ধিমান' রাখি, কিন্তু হইয়া উঠিল না। আমি প্রথম প্রথম আমার নূতন কলগুলির সংস্কৃত নাম দিয়াছিলাম; যেমন "কুঞ্চনমান" এবং 'শোষণমান'। স্বদেশী প্রচার করিতে যাইয়া অতিশয় বিপন্ন হইতে হইয়াছে। প্রথমত, এই সকল নাম কিম্ভূত-কিমাকার হইয়াছে বলিয়া বিলাতি কাগজ উপহাস করিলেন।

কেবল বোস্টনের প্রধান পত্রিকা অনেকদিন আমার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। সম্পাদক লেখেন, "যে আবিষ্কার করে, তাহারই নামকরণের প্রথম অধিকার। তাহার পর নূতন কলের নাম পুরাতন ভাষা ল্যাটিন গ্রীক হইতেই হইয়া থাকে। তাহা যদি হয় তবে অতি পুরাতন অথচ জীবন্ত সংস্কৃত হইতে কেন হইবে না?" বল-পূর্বক যেন নাম চালাইলাম। কিন্তু ফল হইল অন্যরূপ। গতবারে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতার সময় তথাকার বিখ্যাত অধ্যাপক আমার কল 'কাঞ্চনম্যান' সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। প্রথমে বুঝিতে পারি নাই! শেষে বুঝিলাম "কুঞ্চনমান" "কাঞ্চনম্যানে" রূপান্তরিত হইয়াছে। হাণ্টার সাহেবের প্রণালী মতে কুঞ্চন বানান করিয়াছিলাম হইয়া উঠিল কাঞ্চন।..."

আজকের দিনের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল প্রচারের পথ মোটামুটিভাবে যথাযথ নিয়মে বাঁধা। কিন্তু সেসময় জগদীশচন্দ্রের পক্ষে তা ছিল অন্যরকম। বৈজ্ঞানিক মতবাদকে স্থায়ীরূপ দিতে জগদীশচন্দ্রকে বার দশেক বিদেশ যাত্রা করতে হয়েছিল। কখনো জাহাজে, কখনো বা স্থল পথে। সেই সুদূর ইয়োরোপে। এ সব যাত্রায় সঙ্গে থাকতো পরীক্ষার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও পরীক্ষা প্রদর্শনের উপযোগী গাছপালা। এককথায়, দেশের পরাধীনতা ও চাপিয়ে দেওয়া অনুন্নত অবস্থা থেকে তৈরী বাধা বিপত্তির বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রাম ছিল জগদীশচন্দ্রের সমস্ত জীবন। উদ্ভিদ তত্ত্ব বিষয়ে জগদীশচন্দ্রের গবেষণার সময়সীমা তেত্রিশ বছর। সেই সূত্রে তিনি শতাধিক আশ্চর্য যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। আর এই বিষয়ে ১১টি বড় বই লিখে গেছেন। বর্তমানে তাঁর উদ্ভাবিত দু'একটি যন্ত্রের কথা তোমাদের বলব।

উদ্ভিদ গবেষণার প্রথম সার্থক ও সাড়া জাগানো যন্ত্র "রেজোনাণ্ট রেকর্ডার"। প্রাণিদেহের মত উদ্ভিদের ভেতরেও যে "রিফ্লেক্স

আর্কের" অস্তিত্ব রয়েছে তা এই যন্ত্র দিয়ে দেখা যায়। এই পরীক্ষার জন্য তিনি বেছে নিয়েছিলেন লজ্জাবতীগাছ। লজ্জাবতীর একটি উপপত্রে বৈদ্যুতিক বা যান্ত্রিক আঘাত দিয়ে দেখলেন আঘাতের স্থান থেকে লজ্জাবতীর ছোট ছোট পাতা বন্ধ হতে হতে পত্রমূল পর্যন্ত যায়। তখন বাকি উপপত্রগুলিতে কোন সাড়া দেখতে পাওয়া যায় না। আঘাত পত্রমূলে পৌঁছে বিপরীতমুখী হয়ে ফিরে আসে অন্যান্য পাতায়। তখন বাকি পাতা বন্ধ হয়। উদ্ভাবিত যন্ত্রের কার্যক্ষমতা বড় অদ্ভুত। উত্তেজনার গতিবেগের এক সেকেণ্ডের দু'শো ভাগের একভাগ সময়ের তারতম্য থাকলেও তা এই যন্ত্র জানিয়ে দেয়। জগদীশচন্দ্র পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন, লজ্জাবতী পাতায় উত্তেজনা দিলে উত্তেজনার গতিবেগ এক সেকেণ্ডের চারশো মিলিমিটার পর্যন্ত হতে পারে।

গাছটির নাম বনচাঁড়াল। শুদ্ধ বাংলায় বনচণ্ডাল। এর কাণ্ডের প্রতিপর্বে তিনটি করে পাতা থাকে। মাঝের পাতাটি বড় আর দু'পাশে দুটি ছোট পাতা। যেন দুটি হাত। এই ছোট পাতা দুটি সদাই কর্মচঞ্চল। অনেকটা যেন রাস্তার মোড়ের ট্রাফিক পুলিশের মত। একবার পাতা দুটি উপরে ওঠে আর একবার নিচের দিকে নামে। এই ওঠানামা সর্বদাই চলতে থাকে। বনচাঁড়ালের এই স্বতঃস্পন্দন আপাত কোন কারণ ছাড়াই খালি চোখে—দেখতে পাওয়া যায়। এই অদ্ভুত চলনের জন্য বিজ্ঞানীদের মনে গাছটি সম্পর্কে জানার কৌতূহল জেগেছিল সেই প্রাচীনকাল থেকেই। এই গাছ ও তার পাতার চলন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা বেশ মজার। গ্রামের রাখাল ছেলেদের ধারণা ছিল, হাতের তুড়ি দিলেই পাতাদুটি নাচ শুরু করে। শোনা যায়, ইংলণ্ডের রানী নাকি একবার পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন গাছটির সম্পর্কে আরও খোঁজখবরের আশায়। আচার্য জগদীশচন্দ্রের আগে যে সব বিজ্ঞানী এই স্পন্দনের গতিপ্রকৃতি নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন, তাঁরা কেউই

কৃতকার্য হননি। অন্তরায় ছিল সঠিক সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক যন্ত্র নির্মাণের অক্ষমতা। সেই অক্ষমতাই হয়তো গাছটিকে সেকালে রহস্যময় করে তুলেছিল সাধারণ মানুষের কাছে। এই সমস্যা সমাধানে অনেক পরিশ্রমের পর জগদীশচন্দ্র আবিষ্কার করেন "প্লান্ট ফাইটোগ্রাফ" যন্ত্র। এই যন্ত্র দিয়ে গাছটি পরীক্ষা করে জগদীশচন্দ্র আশ্চর্য এক তরুলিপি পেলেন। জগদীশচন্দ্র এই তরুলিপিকে তুলনা করেছিলেন প্রাণিদেহের হৃদস্পন্দন লিপির সঙ্গে।

গাছের বৃদ্ধি অনেকগুলো শর্তের ওপর নির্ভরশীল। তাছাড়া বৃদ্ধির হারও খুব কম। জগদীশচন্দ্রের আগে যে সব যন্ত্রের চলন ছিল তা দিয়ে বেশ কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা না করলে বৃদ্ধির কোন হিসেব পাওয়া সম্ভব ছিল না। যা পাওয়া যেত তাও যথেষ্ট ত্রুটি-পূর্ণ। 'তখনকার প্রচলিত যন্ত্রগুলোর প্রসারণ ক্ষমতাও কুড়িগুণের অধিক ছিল না। তাছাড়া বিভিন্ন বৃদ্ধিকারক ওষুধ প্রয়োগের ফলাফল দেখার সুষ্ঠু কোন ব্যবস্থা ছিল না বললেই চলে। অথচ কৃষিকার্যে গাছের বৃদ্ধি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে জগদীশচন্দ্র উপলব্ধি করলেন, গাছের বৃদ্ধির সঠিক হার, বিভিন্ন উত্তেজক পদার্থ বা সার প্রয়োগে গাছের প্রতিক্রিয়া জানতে গেলে দরকার পরীক্ষার সময়কালকে সীমিত করা আর অনেক গুণ বর্ধিত আকারে বৃদ্ধির তরুলিপি নেওয়া। এসব কথা মনে রেখে জগদীশচন্দ্র একটি গাছ এক সেকেণ্ডে যতটা বাড়ে তার দশ হাজার গুণ বড় করে বৃদ্ধির হার লিপিবদ্ধ করলেন "কমপাউণ্ড লিভার ক্রেস্কোগ্রাফ" যন্ত্র দিয়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯১৪ সালে জগদীশচন্দ্র যখন এই যন্ত্রের পরীক্ষা আমেরিকায় দেখিয়ে ছিলেন তখন আমেরিকান বিজ্ঞানীরা যন্ত্রটিকে আলাদীনের প্রদীপের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।
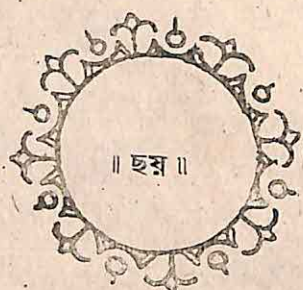
১৯১১।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন বসল মৈমনসিংহে। এই অধিবেশনে সভাপতি পদে নির্বাচিত হলেন জগদীশচন্দ্র। এ তাঁর স্বদেশ ও সাহিত্য সেবার পুরস্কার। জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা দিতে ময়মনসিংহ আসবেন এই সংবাদে চারদিকে সাড়া পড়ে গেল। সভায় স্থান সঙ্কুলান হবে না আশঙ্কায় সম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহারাজা কুমুদচন্দ্র সিংহ চিঠি লিখলেন জগদীশচন্দ্রকে। বললেন, বক্তৃতার দিন আমরা প্রবেশ মূল্য ধার্য করতে চাই। এ ব্যবস্থা ছাড়া ভীড় সামলাবার আর কোন উপায় দেখছি না। জগদীশচন্দ্র এ ব্যবস্থা মেনে নিতে পারলেন না। উত্তরে তিনি জানালেন, শুধু বিত্তশালী লোকের জন্য তিনি বক্তৃতা দিতে ময়মন-সিংহ যেতে রাজী নন। কোন কারণেই যেন প্রবেশমূল্য ধার্য করা না হয়। দরকার হলে তিনি দু'দিন বক্তৃতা দেবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জগদীশচন্দ্র দু'দিন ভাষণ দিয়ে-ছিলেন। একদিন বাংলায় অন্যদিন ইংরেজীতে। বাংলা বক্তৃতাটি ১৩১৮ সালের বৈশাখ সংখ্যায় "প্রবাসী" পত্রিকায় মুদ্রিত হয়।

ভাষণটি আজ সর্বকালের প্রশংসনীয় বক্তৃতারূপে বাংলা সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। তাই ভাষণের কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি—

"কবি এই বিশ্ব-জগতে তাঁহার হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়া একটি অরূপকে দেখিতে পান, তাহাকেই তিনি রূপের মধ্যে প্রকাশ করিতে থাকেন। অন্যের দেখা যেখানে ফুরাইয়া যায় সেখানেও তাঁহার ভাবের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না। সেই অপরূপ দেশের বার্তা তাঁহার কাব্যের ছন্দে ছন্দে নানা আভাসে বাজিয়া উঠিতে থাকে। বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে কিন্তু কবিত্ব সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায় সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন। শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌছায় সেখান হতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন।...

বৈজ্ঞানিককে যে পথ অনুসরণ করিতে হয় তাহা একান্ত বন্ধুর। এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের কঠোর পথে তাঁহাকে সর্বদা আত্মসংবরণ করিয়া চলিতে হয়। সর্বদা তাঁহার ভাবনা, পাছে নিজের মন নিজেকে ফাঁকি দেয়। এজন্য পদে পদে মনের কথাটা বাহিরের সঙ্গে মিলাইয়া চলিতে হয়। দুই দিক হইতে যেখানে না মিলে সেখানে একদিকের কথা কোনমতেই গ্রহণ করিতে পারেন না।...

আমাদের সৃজন শক্তিরই একটি চেষ্টা বাংলা সাহিত্য পরিষদে আজ সফল মূর্তি ধারণ করিয়াছে। এই পরিষদকে আমরা কেবল-মাত্র একটি সভাস্থল বলিয়া গণ্য করিতে পারি না; ইহার ভিত্তি কলিকাতার কোন বিশেষ পথপার্শ্বে স্থাপিত হয় নাই, এবং ইহার অট্টালিকা ইষ্টক দিয়া গ্রথিত নহে। ইহার ভিত্তি সমস্ত বাংলা দেশের মর্মস্থলে স্থাপিত।"

এই বছরে দিল্লী দরবার উপলক্ষে ভারত সরকার জগদীশচন্দ্রকে সি. আই. ই. ও. এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানিত 'ডক্টর অব সায়ান্স' উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯১৩।

বাঙালী তথা ভারতবাসীর সাংস্কৃতিক জীবনে বিশেষ ভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ লাভ করলেন। ঠিক তার এক বছর আগে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া সোসাইটি থেকে কবির 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়ে য়ুরোপের চিত্তলোক জয় করেছে। অনুবাদ কবি নিজেই করেছিলেন। বাঙালী কবির বাণী জগৎ কবিসভায় স্বীকৃতি পেলো। বিদেশে বিজ্ঞানী সমাজে জগদীশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠালাভের ঠিক এক যুগ পরে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি রূপে বন্দিত ও স্বীকৃত হলেন। তাঁর বন্ধুর সাহিত্যসাধনা য়ুরোপে যথাযোগ্য সমাদর লাভ করুক, তাঁর সাহিত্য ইংরেজী ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হোক, এই ছিল জগদীশচন্দ্রের ঐকান্তিক কামনা।

যেদিন কলকাতায় কবির নোবেল প্রাইজ পাওয়ার খবর এলো, সেদিন জগদীশচন্দ্রই সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হয়েছিলেন। এই দুর্লভ সম্মান লাভের দু'বছর আগে কবির পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বিপুলভাবে রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করেন। সেই শুভ অনুষ্ঠানেও জগদীশচন্দ্র অংশ গ্রহণ করেছিলেন। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর যখন তাঁর স্বদেশবাসী শান্তিনিকেতন গিয়ে কবিকে অভিনন্দিত করেন, সেদিনও সকলের পুরোভাগে ছিলেন জগদীশচন্দ্র। সেদিন শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে যে ঐতিহাসিক সংবর্ধনা সভা হয়েছিল, সর্বসম্মতিক্রমে তার সভাপতি ছিলেন তিনিই।

কবির এই সম্মানলাভে উল্লসিত হয়ে জগদীশচন্দ্র ব্যক্তিগত ভাবে তাঁকে একখানি সুন্দর চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন,—'বন্ধু, পৃথিবীতে তোমাকে এতদিন জয়মাল্য ভূষিত না দেখিয়া বেদনা অনুভব করিয়াছি। আজ সেই দুঃখ দূর হইল। দেবতার এই করুণার জন্য কি করিয়া আমার কৃতজ্ঞতা জানাইব?

চিরকাল শক্তিশালী হও, চিরকাল জয়যুক্ত হও। ধর্ম তোমার চির সহায় হউন।'—তোমার জগদীশ।

১৯১৪ সালের বৈজ্ঞানিক অভিযান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। নানা কারণে তাঁর এই বছরের অভিযান উল্লেখযোগ্য। এই সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন—ভারত গভর্নমেণ্ট ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে আমার নূতন আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রচার করিবার জন্য আমাকে পর্যটনে প্রেরণ করেন। সেই উপলক্ষে লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, প্যারিস, ভিয়েনা, হার্ভার্ড, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, ফিলাডেলফিয়া, শিকাগো, ক্যালিফোর্নিয়া, টোকিও ইত্যাদি স্থানে আমার পরীক্ষা প্রদর্শিত হয়। এই সকল স্থানে জয়মাল্য লইয়া কেহ আমার প্রতীক্ষা করে নাই এবং আমার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিগণ আমার ত্রুটি দেখাইবার জন্যই দলবদ্ধ হইয়া উপস্থিত ছিলেন। তখন আমি সম্পূর্ণ একাকী, অদৃশ্যে কেবল সহায় ছিলেন ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মী। এই সংগ্রামে ভারতেরই জয় হইল এবং যাঁহারা আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, তাঁহারা পরে আমার পরম বান্ধব হইলেন।'

এবার জগদীশচন্দ্র সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি ছাড়া সঙ্গে নিলেন গোটাকতক লজ্জাবতী ও বনচাঁড়াল গাছ। এইসব যন্ত্রপাতি নিয়ে দেশভ্রমণ করা এক কঠিন ব্যাপার। অনেক সময়ে জগদীশচন্দ্রকে নিজেই ঐসব যন্ত্রপাতি বহন করে নিয়ে যেতে হতো, এমন সন্তর্পণে এগুলি স্থানান্তরিত করতে হয়। এ বরং সম্ভব। কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশের গাছপালা দারুণ শীতেজ দেশে নিয়ে গিয়ে বাঁচিয়ে রাখা এক রকম অসম্ভব। পৃথিবীর মানুষ জানে, বিজ্ঞানের সাধনায় কি রকম একনিষ্ঠ ও দৃঢ়চিত্ত ছিলেন জগদীশচন্দ্র—কোন বাধাই তাঁর কাছে বাধা বলে গণ্য হতো না। উদ্ভাবন করলেন বিশেষভাবে তৈরি একটি কাচের ঘর; তারই মধ্যে এইসব গাছপালা নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হলো। অর্ধেক গাছ পথেই মরে গেল, কিন্তু বাকিগুলো লণ্ডনে পৌঁছে গরম ঘরে আরামে বাস করতে লাগল।

কাজের সুবিধার জন্য এবার জগদীশচন্দ্র লণ্ডনের একটি স্থানে নিজস্ব একটা ল্যাবোরেটরি স্থাপন করেছিলেন। অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে, রয়্যাল ইনস্টিটিউশন ও রয়্যাল সোসাইটিতে তিনি বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। তাঁর উদ্ভাবিত নতুন যন্ত্রগুলি গাছের জীবনের সেই সব রহস্য উদ্‌ঘাটন করল যা এতকাল লোকচক্ষুর কাছে অস্পষ্ট ছিল। লোকে এবার খুব আগ্রহ দেখাল। বিজ্ঞানী ও অবৈজ্ঞানিক সবাই তাঁর বক্তৃতা শুনতে আসত। লণ্ডনে কিছুকাল কাটিয়ে জগদীশচন্দ্র গেলেন প্যারিস, ভিয়েনা ও বার্লিন। প্রত্যেক জায়গায় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচার ও প্রদর্শন করলেন তাঁর আশ্চর্য আবিষ্কার। উদ্ভিদ্‌বিদ্যার গবেষণায় তখন ভিয়েনার রয়্যাল ইউনিভার্সিটির খুব নাম। এখানে শারীরবিজ্ঞান সম্পর্কে বিশেষ-ভাবে গবেষণা হতো এবং এজন্য একটা পৃথক প্রতিষ্ঠানও ছিল। তার পরিচালক অধ্যাপক মোলিশ খুব আগ্রহ ও সমাদরের সঙ্গে অভ্যর্থনা করলেন ভারতীয় বিজ্ঞানীকে। জগদীশচন্দ্রের য়ুরোপ ভ্রমণ এখনো শেষ হয় নি, এমন সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো। তিনি জার্মানি থেকে ফিরে আমেরিকা যাত্রা করলেন।

এবার তিনি যুক্তরাষ্ট্রে বিপুল অভ্যর্থনা লাভ করলেন। বহু বিজ্ঞান সভা ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি নিমন্ত্রিত হলেন বক্তৃতা দেবার জন্য। কিন্তু এবার জগদীশচন্দ্র মাত্র কয়েক সপ্তাহ আমেরিকায় ছিলেন। কাজেই নিমন্ত্রিত হয়েও সব স্থানে উপস্থিত থাকতে পারেন নি। যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনতে ও experiment দেখতে তিন হাজারেরও বেশি লোকের সমাবেশ হয়েছিল। ১৯১৫ সালের জুন মাসে জাপান হয়ে তিনি ভারতে ফিরে এলেন।

১৯১৫ সালটি বৈজ্ঞানিকের জীবনে আরো একটি কারণে স্মরণীয় হয়ে আছে। একত্রিশ বছর অধ্যাপনার পর প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে তিনি অবসর নিলেন। কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁকে সম্মানীয়

অবৈতনিক অধ্যাপকরূপে পরিগণিত করলেন। কলেজের ল্যাবোরেটরিতে তাঁর ইচ্ছামত গবেষণা করার স্বাধীনতা তাঁকে দেওয়া হলো। ভারত সরকারও এখন থেকে তাঁর গবেষণা কাজ চালাবার জন্য তাঁকে বছরে লক্ষ টাকা দিয়ে সাহায্য করতে লাগলেন। এই বছর তিনি আরো দুটি সম্মান লাভ করেন। লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে স্যর মাইকেল স্যাডলার[১] জগদীশচন্দ্রকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠান হয় প্রেসিডেন্সি কলেজে। এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এল. এল-ডি উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯১৭ সালে তিনি 'নাইট' উপাধি পেলেন।

জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান মন্দিরের স্বপ্ন দেখেছিলেন বহু বছর আগে। ১৮৯৭ সালের জানুয়ারী মাসে। প্রথম রয়াল সোসাইটির বক্তৃতার পর। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি তাঁর সমস্ত জীবনের কষ্টার্জিত সঞ্চয়কে একত্রিত করে বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার কাজে হাত দিলেন। আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা চেয়ে চিঠি পাঠালেন শুভানুধ্যায়ীদের। অধ্যাপক ভাইনসকে (বিলেতে জগদীশচন্দ্রের শিক্ষক) বললেন, দেশের ভাবীকালের অনাগত বিজ্ঞান কর্মীরা যেন তাঁর মত অসহায় অবস্থার সম্মুখীন না হয়। সেই লক্ষ্য সামনে রেখেই তিনি বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে চলেছেন। তিনি আরও বললেন, "আমার স্ত্রী ও আমি এই গবেষণাগারের জন্য সর্বস্ব দান করছি।"

প্রস্তুতি পর্বের শেষলগ্নে বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে আমেরিকা যেতে হয়। তিনি সেখান থেকে জগদীশচন্দ্রকে লিখলেন, "তোমার বিজ্ঞান-মন্দিরে প্রথম সভা উদ্বোধনের দিনে আমি যদি থাকতে পারতুম তা' হ'লে আমার খুব আনন্দ হ'তো। বিধাতা যদি দেশে ফিরিয়ে

---

১. স্যর মাইকেল স্যাডলার ছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। সেই সময়ে ইনি এদেশে এসেছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার কমিশনের সভাপতি হিসাবে; তাই এই কমিশনের নাম ছিল স্যাডলার কমিশন।

আনেন তা' হ'লে তোমার এই বিজ্ঞান যজ্ঞশালায় একদিন তোমার সঙ্গে মিলনের উৎসব হবে একথা মনে রইল। এতদিন যা তোমার সংকল্পের মধ্যে ছিল আজকে তার সৃষ্টির দিন এসেছে। কিন্তু এতো তোমার একলার সংকল্প নয়, এ আমাদের সমস্ত দেশের সঙ্কল্প, তোমার জীবনের মধ্যে দিয়ে এর বিকাশ হ'তে চলল। জীবনের ভিতর দিয়েই জীবনের উদ্বোধন হয় তোমার প্রাণের সামগ্রীকে তুমি আমাদের দেশের প্রাণের সামগ্রী ক'রে দিয়ে যাবে—তারপর থেকে সেই চিরন্তন প্রাণের প্রবাহে আপনিই সে এগিয়ে চলতে থাকবে।...তুমি যে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির মত তোমার মন্ত্রকে অন্তরে প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়েছে, এর জন্য বাইরে তাকে প্রকাশ করবার পূর্ণ অধিকার ঈশ্বর তোমাকে দিয়েছেন।..."

১৯১৭ সালের ৩০শে নভেম্বর। নিজের জন্মদিনে ঐতিহাসিক বসু-বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসব শুরু হল। বিজ্ঞান মন্দিরের সদ্য নির্মিত বক্তৃতাশালায়। অনুষ্ঠান শুরুর আগে সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ রচিত সঙ্গীত ঃ

"মাতৃমন্দির—পূণ্য—অঙ্গন
কর মহোজ্জ্বল আজ হে।
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজহে...।"

ঠিক সন্ধে-ছ'টা। জগদীশচন্দ্র তাঁর ভাষণে বললেন,

"...কি সেই মহাসত্য যাহার জন্য, এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল? তাহা এই যে মানুষ যখন তাহার জীবন ও আরাধনা কোনো উদ্দেশ্যে নিবেদন, করে, সেই উদ্দেশ্য কখনও বিফল হয় না ; তখন অসম্ভবও সম্ভব হইয়া থাকে। সাধারণের সাধুবাদ শ্রবণ আজ আমার উদ্দেশ্য নহে ; কিন্তু যাহারা কর্মসাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন এবং প্রতিকূল তরঙ্গাঘাতে মৃতকল্প হইয়া অদৃষ্টের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আমার কথা বিশেষভাবে কেবল তাঁহাদেরই জন্য।...

বিলাতের ন্যায় এদেশে পরীক্ষাগার নাই। সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মাণও এদেশে কোনদিন হইতে পারে না, তাহাও কতবার শুনিয়াছি। তখন মনে হইল, যে ব্যক্তি পৌরুষ হারাইয়াছে কেবল সে-ই বৃথা পরিতাপ করে। অবসাদ দূর করিতে হইবে, দুর্বলতা ত্যাগ করতে হইবে। ভারতই আমাদের কর্মভূমি। সহজ পন্থা আমাদের জন্য নহে। তেইশ বৎসর পূর্বে অদ্যকার দিনে এই সকল কথা স্মরণ করিয়া একজন তাহার সমগ্র মন, সমগ্র প্রাণ ও সাধনা ভবিষ্যতের জন্য নিবেদন করিয়াছিল। তাহার ধনবল কিছুই ছিল না, তাহার পথপ্রদর্শকও কেহ ছিল না। বহু বৎসর ধরিয়া একাকী প্রতিদিন প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুঝিতে হইয়াছিল। এতদিন পরে তাহার নিবেদন সার্থক হইয়াছে।...

যে সকল আশা ও বিশ্বাস লইয়া আমি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলাম তাহা কি একজনের জীবনের সঙ্গেই সমাপ্ত হইবে? একটি মাত্র বিষয়ের জন্য বীক্ষণাগার নির্মাণে অপরিমিত ধনের আবশ্যক হয়; আর এইরূপ অতি বিস্তৃত এবং বহুমুখী জ্ঞানের বিস্তার যে আমাদের দেশের পক্ষে অসম্ভব, একথা বিজ্ঞজনমাত্রেই বলিবেন। কিন্তু আমি অসম্ভাব্য বিষয়ের উপলক্ষে কেবলমাত্র বিশ্বাসের বলেই চিরজীবন চলিয়াছি, ইহা তাহারই মধ্যে অন্যতম। "হইতে পারে না" বলিয়া কোনদিন পরাঙ্মুখ হই নাই; এখনও হইব না। আমার যাহা নিজস্ব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম তাহা এই কার্যেই নিয়োগ করিব।...

বিজ্ঞান-মন্দিরের কাজকর্ম চালাতে আরোও অনেক অর্থের প্রয়োজন। সরকারের তরফ থেকে ভারত সচিব এক চিঠিতে জানালেন, কিছু অর্থসাহায্য হয়তো বিজ্ঞান মন্দিরকে দেওয়া যেতে পারে; তবে তা দেওয়া হবে, জনগণের তরফ থেকে কি পরিমাণ সমর্থন ও আর্থিক সাহায্য আসে তার ভিত্তিতে। জগদীশচন্দ্র আবেদন জানালেন দেশবাসীর উদ্দেশে। বললেন, "আমার

স্বোপার্জিত অর্থে পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্ব শুরু হয়েছে মাত্র। এই মন্দিরের বৈজ্ঞানিক কর্মধারাকে আমি বহুদূর প্রসারিত করতে চাই, তার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।”

অর্থসাহায্যে সামিল হলেন দেশের সকল শ্রেণীর মানুষ। রাজা মহারাজা ব্যবসায়ী, সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে দীন-দরিদ্র কেউ বাদ গেলেন না। এদের মধ্যে কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, মহারাজা গায়কোয়াড়, বোমনজী, মুলরাজ খাটাউ-এর ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া এগিয়ে এলেন মহাত্মা গান্ধী ও জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা। জগদীশচন্দ্রও থেমে রইলেন না। অর্থসংগ্রহের জন্য জানুয়ারী ১৯১৮ সাল থেকে শুরু করেছিলেন ধারাবাহিক বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা।

তোমরা বড়ো হয়ে একদিন যখন এটি দেখতে আসবে তখন দেখবে কী অপূর্ব এর পরিকল্পনা। কারণ বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র ছিলেন আর্টের একজন বড় সমঝদার। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রাক্তন কর্মী আশুতোষ গুহঠাকুরতা তাঁদের স্মৃতিকথায় এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছিলেন, “ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল এবং পাশ্চাত্য দেশে সেই সভ্যতার বাহকরূপে নিজের পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতেন। বিজ্ঞানমন্দির রচনায়ও তিনি সেই প্রাচীন আদর্শেরই অনুবর্তী হয়েছিলেন। নালান্দা-তক্ষশীলার ঐতিহ্য বহন চলবে এই উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরগৃহ নির্মাণেও তিনি নালান্দার স্থাপত্য রীতি অনুসরণ করেন। বিজ্ঞান-মন্দির রূপায়ণে ও তৎসংলগ্ন উদ্যান রচনায়, তিনি যে বৈজ্ঞানিক প্রতিভার অন্তরালে একটি শিল্পীমন সযত্নে লালন করতেন তা প্রকাশ পেয়েছে। উদ্যানের স্থানে স্থানে কৃত্রিম পাহাড়, ঝর্ণা, নদী, হ্রদ কোথাও বা পাহাড়ের উপর ক্ষুদ্র সেতু এবং পরিবেশ অনুযায়ী বিভিন্ন উদ্ভিদের দ্বারা সজ্জিত করে নানা রম্যদৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। কোথাও কোন

অসামঞ্জস্য তাঁর নজরে এলে তখনই তা পরিবর্তনের আদেশ দিতেন। উদ্যানের কোথাও বা গাছের ওপর একটি ঘর বা মঞ্চ। হরিণ, ময়ূর, সারস ও অন্যান্য নানারূপ পাখি রাখার নানা ব্যবস্থা—এই সব মিলিয়ে সেখানে একটি তপোবনের পরিবেশই সৃষ্টি হয়েছিল।”

বসুবিজ্ঞান মন্দিরের অন্য আর এক স্বনামধন্য কর্মী ডঃ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছিলেন, “বিজ্ঞান মন্দিরের সুবৃহৎ অট্টালিকা, হল ঘর, বক্তৃতা-গৃহ, গবেষণাকক্ষ প্রভৃতি সবকিছুই ভারতীয় পদ্ধতি অনুসরণে জগদীশচন্দ্র কর্তৃক পরিকল্পিত! বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতীক চিহ্ন বজ্র ও অর্ধামলক তাঁহার নিজের পরিকল্পনা। নির্যাতিত দেবতাদের দুর্দশা মোচনের জন্য মৃত্যুবরণ করিয়া দধীচি নিজের অস্থি দান করিয়াছিলেন—আর সসাগরা ধরণীর অধিপতি মহারাজা অশোক যথাসর্বস্ব দান করিয়া আধখানা মাত্র আমলকি নিজের জন্য রাখিয়াছিলেন, অপরের প্রয়োজন সেই অবশিষ্ট আমলকি-খণ্ড দান করিয়া রিক্ত-হস্তে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। এই আদর্শকেই তিনি প্রতীক-চিহ্নে রূপায়িত করিয়া বিজ্ঞান মন্দিরের সর্বত্র অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনের কর্মধারা পরিসমাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার আদর্শকে যেভাবে বাস্তবে রূপায়িত করিয়া গিয়াছেন তাহার সহিত এই প্রতীকের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে।”

এ প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্রের ছাত্র-দরদী মন ও তাঁর দেশের প্রতি মমত্ববোধের একটি ছোট্ট কাহিনী জগদীশচন্দ্রের প্রাক্তন ছাত্র অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের স্মৃতিকথা থেকে তুলে ধরছি। চারুবাবু লিখেছিলেন, আমরা তখন এম. এ ক্লাসে তাঁহার ছাত্র। তিনি সকল ছাত্রকে একদিন বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। খাবারের আয়োজন হইতেছে। তিনি ছেলেদের সহিত গল্প করিতেছেন। কিছুদিন পূর্বে এদেশে ফনোগ্রাফ আসিয়াছে। দেশী

রেকর্ডসও প্রস্তুত হইতেছে। তিনি ফনোগ্রাফে একটা গান দিলেন। গানের গোড়াটা এই—"মন মাঝি তোর বইঠা নেরে,—আমি আর বাইতে পারলাম না।"

গানটা শেষ করিতে দিলেন না। বলিয়া উঠিলেন—দেখ বিদেশীরা বলে আমরা অসভ্য জাত। কিন্তু দেখ সমাজের নিম্নস্তর অবধি আমাদের শিক্ষা, আমাদের সভ্যতা কিরূপ পৌঁছিয়াছে। একটা চাষা বাড়ী ফিরিবার সময় পথে যে কথাগুলি বলিতেছে সেগুলি মন দিয়া তোমরা শোন—বলিয়া আবার গানটি দিলেন। গান শেষে তাঁহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি আবার আরম্ভ করিলেন—আমার বড় ক্ষোভ এই যে আমাদের প্রকৃত গৌরব ভুলিয়া মিথ্যা আড়ম্বর লইয়া আমরা পড়িয়া আছি। বাহিরের অনেক দেশ ভাল করিয়া দেখিয়া এখন বুঝিতে পারি, কোন দেশে সভ্যতা এতদূর নিম্নস্তর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে। অন্য কোন্ জাতি অনার্যকে আর্য করিতে পারিয়াছে?"

১৯২০।

জগদীশচন্দ্রের শিরে বর্ষিত হলো একটি আন্তর্জাতিক সম্মান। এই বছরে তিনি লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির 'ফেলো' (Fellow) নির্বাচিত হলেন। ভারতবর্ষে তিনিই দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি য়ুরোপের এই প্রখ্যাত বিদ্বদ্‌সভা থেকে অর্জন করেন এই দুর্লভ সম্মান। এদেশের প্রথম এফ. আর.এস. (F. R. S.) হলেন মাদ্রাজের বিখ্যাত গাণিতিক রামানুজম্। ভারতবাসী—বিশেষ করে বাঙালীর কাছে এটা ছিল বিশেষ গর্বের বিষয়। সাত বছর আগে তারা ঠিক এমনি গর্ব বোধ করেছিল রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার পাওয়াতে।

যে বছর জগদীশচন্দ্র রয়্যাল সোসাইটির 'ফেলো' নির্বাচিত হলেন, সেই বছরটি ভারতের বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে আরো একটি কারণে স্মরণীয় হয়ে আছে। এই বছরে প্রফুল্লচন্দ্রের যুগান্তকারী গ্রন্থ 'হিস্ট্রি অব হিন্দু কেমিস্ট্রি' (হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস) প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। জগদীশচন্দ্রের মতো প্রফুল্লচন্দ্রেরও চেতনায় ছিল ভারতবর্ষ। সুদূর অতীতে পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন জাতির মতো ভারতবাসীও যে রসায়নে পারদর্শী ছিল, সেই লুপ্ত মহিমা তাঁরদীর্ঘ দিনের গবেষণার ফলে নতুন করে আমাদের সামনে

তুলে ধরলেন প্রফুল্লচন্দ্র। আধুনিক কালের ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র—এই দুটি নামই চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

১৯২৭ সালের অক্টোবর মাস। জগদীশচন্দ্র একটি চিঠি পেলেন মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের কাছ থেকে। অধ্যাপক শীল জগদীশচন্দ্রকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ প্রদানের জন্য। এই আমন্ত্রণের পরিপ্রেক্ষিতে জগদীশচন্দ্র ৩রা নভেম্বর তারিখে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে দীক্ষান্ত ভাষণ দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জগদীশচন্দ্র নানা সময়ে দেশের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়েই ভাষণ প্রদান করেছিলেন। বর্তমানে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ভাষণের অংশ বিশেষ তোমাদের কাছে তুলে ধরছি। আশা করি তোমাদের ভাল লাগবে। জগদীশচন্দ্র তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, আমি বহু বর্ষ পূর্বে শিক্ষকতা আরম্ভ করিয়াছিলাম—বৃত্তি হিসাবে নহে। সর্বশ্রেষ্ঠ হিসাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্তির পর ও যাহাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয় নাই, সে সমস্ত যুবকদিগকে পরিচালিত করিয়া মনুষ্যত্ব লাভে সাহায্য করাকে জীবনের ব্রত করা অপেক্ষা মহত্তর কিছু ধারণা আমি করিতে পারি নাই।

আমার জীবনযাত্রার প্রারম্ভে আমি প্রায়ই শুনিতাম যে, ভারতবর্ষ প্রাচীন দার্শনিকের দেশ, এজন্যই ভারতবর্ষের যাহা কিছু গৌরব সে গৌরবও লোপ পাইয়াছে। লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার হইবে না। এ সমস্ত কথায় আমি নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিলাম।

তোমরা হয়তো জিজ্ঞাসা করিবে যে, আমার ভ্রান্তি কি করিয়া দূর হইল, বিরাট বিঘ্ন অতিক্রম করিবার অধ্যবসায় আমি কোথা হইতে পাইলাম। আমার উত্তর এই যে, আমার কার্যই ছিল আমার শিক্ষক, ব্যর্থতাই আমাকে আবশ্যক উৎসাহ দিয়াছে এবং অতীতের অভিজ্ঞতাই ছিল আমার উৎসাহের চির উৎস।...

যাহা অসম্ভব বা যাহা শুধু অন্য দেশেই সম্ভব, সে সমস্ত বিষয়ের কথা আজ তোমাদিগকে শুনাইব না। ভারতবর্ষে যাহা করা যাইতে পারে এবং যাহা করা হইয়াছে তাহার কথাই আমি তোমাদিগকে শুনাইব। তোমাদিগকে যে সমস্ত বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয় আমাকেও সেই সমস্ত বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। তোমরা যখন নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিমজ্জিত হইবে তখন তোমরা এই কথাটি স্মরণ রাখিও যে, বহুবর্ষ অধ্যবসায় সহকারে বিঘ্নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার পূর্বে আমি আশার ক্ষীণ আলোক রেখাও দেখিতে পাই নাই। আমার এই বিশ্বাস ছিল যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার নিকট পরাজয় স্বীকার করায় মনুষ্যত্ব নাই। অসীম সাহসে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সম্মুখীন হইয়া তাহাকে পরাজিত করাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব।...

সমালোচকগণ বলেন যে, ভারতবাসীর মধ্যে জ্ঞানের অনুশীলন এবং শিক্ষা প্রচার করিবার যোগ্যতা ভারতবর্ষের নাই। তাঁহারা বলেন যে, ভারতে সার্বজনীন আদর্শ নাই। বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত অধিবাসীদের মধ্যে কোন সংযোগ সূত্র নাই। তাহার অতীত ও বর্তমানের অব্যাহত পারম্পর্য নাই—আছে শুধু অসহিষ্ণু শাস্ত্রের অনুশাসন, যুক্তির পরিবর্তে শাস্ত্রের আদেশ—কল্পনাপ্রিয় বলিয়া ভারতবাসীরা সত্যজ্ঞান পথে অগ্রসর হইতে পারে না; বিজ্ঞানের অনুশীলন সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য, ভারতীয় সভ্যতার সহিত তাহার সামঞ্জস্য নাই—এই সমস্ত উক্তি অজ্ঞতা প্রসূত এবং সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

প্রাচীন ভারতে রাজপুত্র এবং সাধারণ প্রজার পুত্রকে গুরুগৃহে একই প্রকার আড়ম্বরবিহীন জীবনযাপন করিতে হইত। এরূপ ব্যবস্থা অন্য কোন দেশে আছে বলিয়া আমি জানি না। আমাদের মহাকাব্যে আমরা দেখিতে পাই যে, তিন হাজার বৎসর পূর্বে হস্তিনাপুর রাজসভার সম্মুখে একটি বিরাট অস্ত্র পরীক্ষা হইয়াছিল। সূতপুত্র কর্ণ রাজপুত্র অর্জুনকে শক্তি পরীক্ষায় আহ্বান করিয়াছিলেন। অর্জুন ঘৃণাভরে এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিয়া

বলিয়াছিলেন—"যাহার কোন বংশ মর্যাদা নাই, রাজপুত্র তাহার সহিত অস্ত্র বিনিময় করেন না।" প্রত্যুত্তরে কর্ণ বলিয়াছিলেন, আমিই আমার বংশের প্রতিষ্ঠাতা, আমার কার্যই আমার আভিজাত্যের পরিচয়।" নিজের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে মানুষের নিজের অধিকারের দাবী বোধ হয় এই সর্বপ্রথম।..."

শিক্ষাদান ও অনুসন্ধিৎসা পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে সংবদ্ধ। শুধু পুরাতন সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াই শিক্ষা দেওয়া চলে না। অনেক সময় এই সমস্ত সিদ্ধান্ত ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হয়। বড়লোকের কথাকেই অভ্রান্ত সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে শিক্ষা দেওয়ার মত অনিষ্ট নাই। বিদ্যার্থীকে নিজে সত্য আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ করাই আচার্যের প্রধান কর্তব্য।

১৯২৮।

জেনিভা থেকে নিমন্ত্রণ এলো জাতি-সঙ্ঘের[১] অধিবেশনে যোগদান করার জন্য। এই সময়ে জগদীশচন্দ্র ইংলণ্ড এবং য়ুরোপের অন্যান্য শহরও পরিদর্শন করেন। অল্পকালের মধ্যে তাঁর আবিষ্কারের ক্ষেত্রও অনেক দূর প্রসারিত হয়েছিল। তাঁর এই সময়কার ভ্রমণের একটি বিবরণ তাঁর ইংরেজ জীবনী চরিতকার এইভাবে উল্লেখ করেছেন—

'অক্সফোর্ড ব্রিটিশ এসোসিয়েশনে ৬ অগস্ট (১৯১৮) জগদীশচন্দ্র ইংলণ্ডের বিখ্যাত শারীরতত্ত্ববিদ্ ও প্রাণিতত্ত্ববিদদের সামনে তাঁর নতুন আবিষ্কারগুলি যন্ত্র সহযোগে দেখালেন। তিনি সেখানে অভ্রান্তভাবে প্রমাণ করলেন যে, উদ্ভিদ ও প্রাণীদের শরীরের

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীতে যুদ্ধ বন্ধ করা ও স্থায়ী শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি সমিতিবদ্ধ হয়ে জেনিভাতে জাতিসঙ্ঘ (League of Nations) স্থাপন করেন। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঐ একই উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয় সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ (U. N. O)

ভেতরকার কলকব্জা, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, আহার গ্রহণ এবং পরিপাক ইত্যাদির প্রাণালী সম্পূর্ণ এক প্রকার। বিজ্ঞানের উন্নতিতে ভারতবর্ষের এ অপূর্ব দান। অক্সফোর্ডের পণ্ডিতেরা জগদীশচন্দ্রের অপূর্ব গবেষণা শুনে তাঁর যন্ত্রের অসাধারণ সূক্ষ্মতা দেখে খুব প্রশংসা করেন। তারে ও বেতারে এই বার্তা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।'

বিদেশের বিজ্ঞানীরা জগদীশচন্দ্রকে এত শ্রদ্ধা করতেন কেন? কারণ সব সময়েই তিনি তাঁর মাতৃভূমির গৌরবকে সামনে রেখে তাঁর গবেষণার বিষয় প্রচার করতেন। বিদেশের কোন সভাতেই তিনি মাথা নত করে দাঁড়াতেন না—সর্বত্রই আত্মসম্মান আর গুরুর প্রাপ্য মর্যাদা নিয়ে চলতেন। জেনিভাতে যখন তিনি উপস্থিত হলেন, সেই সময়ে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ সভায় জগদীশচন্দ্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষিবৃন্দের কাছ থেকে যে প্রশংসা, যে অভিনন্দন পেয়েছিলেন, তেমন প্রশংসাবাদ পৃথিবীর কম বৈজ্ঞানিকের ভাগ্যেই ঘটেছে। তাঁর যুক্তির সারবত্তা ও তাঁর যন্ত্রের অপূর্ব সূক্ষ্মতা দেখে তাঁরা যার পর নাই বিস্মিত হয়েছিলেন। বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক এ্যালবার্ট আইনস্টাইন সব দেখে শুনে বলেছিলেন, ডক্টর বোস যে সব অমূল্য রত্ন পৃথিবীকে উপহার দিয়েছেন তার যে-কোন একটির জন্য বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করা উচিত।

তারপর জগদীশচন্দ্র জেনিভার জাতিসঙ্ঘ (লীগ অব নেশনস্) কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে আন্তর্জাতিক বিদ্বজ্জন সম্মিলনীতে যোগদান করেন। এখানকার আন্তর্জাতিক বিদ্যামন্দিরের মঁসিয়ে লুসার সকল প্রকার প্রাণক্রিয়া যে একই ধরনের তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেখে চমৎকৃত হন এবং এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, জগদীশচন্দ্রের এই আবিষ্কার বিজ্ঞানজগতে সত্যিই এক যুগান্তর এনে দিয়েছে।

এবার ইংলণ্ডে জগদীশচন্দ্র যথাক্রমে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, সোসাইটি অব আর্টস ও রয়্যাল সোসাইটি অব মেডিসিন—এই তিনটি প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। শেষোক্ত স্থানে তিনি উদ্ভিদ ও

প্রাণিদেহে নানা রকম ঔষধের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে গবেষণাধর্মী একটি বিষয় ব্যাখ্যা করেন। বেলজিয়ামের সম্রাট নিমন্ত্রণ করলেন এই খ্যাতিমান ভারতীয় বৈজ্ঞানিককে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতা দেবার জন্য। সেই স্মরণীয় সভায় সপারিষদ সম্রাট ব্যতীত বেলজিয়ামের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপকেরা উপস্থিত ছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর এই বক্তব্য প্রতিপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় উদ্ভিদ রাজকীয় উদ্যান থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। এখানেও তাঁর উদ্ভাবিত তত্ত্ব বিনা প্রতিবাদেই স্বীকৃত হয়েছিল।

জগদীশচন্দ্রের এবারকার য়ুরোপ ভ্রমণ আরো দুটি কারণে স্মরণীয় হয়ে আছে। বিশ্ববিশ্রুত মনীষী ও নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ ভারতের এই বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ঠকে তাঁর লেখা সমস্ত বই উপহার দেন এবং তাতে লিখেছিলেন—'বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রাণিতত্ত্ববিদকে একজন নগণ্য ব্যক্তির উপহার।' আর ফ্রান্সের সর্বজনমান্য ঔপন্যাসিক রোমাঁ রোলাঁ তাঁর অমর উপন্যাস 'জাঁ ক্রিস্তফ' জগদীশচন্দ্রকে উপহার দেবার সময় লিখে দিলেন—'একটি নূতন জগতের আবিষ্কর্তাকে'।

এইভাবে অভ্রভেদী জয় তোরণের ভেতর দিয়ে দিগ্বিজয়ী যোদ্ধার গৌরব নিয়ে এবার জগদীশচন্দ্র প্রত্যাবর্তন করলেন স্বদেশে। ফিরবার পথে মিশর সরকারের অনুরোধে তিনি রাজধানী কায়রোতে গেলেন। এখানেও তিনি বিপুল সংবর্ধনা লাভ করেন ও এশিয়ার মুখোজ্জ্বল-কারী বৈজ্ঞানিক বলে অভিনন্দিত হন। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কোন ভারতীয় পাশ্চাত্য দেশে ঠিক এইভাবে অভিনন্দন লাভ করেন নি। দুই বন্ধুর জীবনে এই সৌভাগ্যলাভ মনে রাখবার মতো।

১৯২৮ সালের ১ ডিসেম্বর।

স্থান : বসু-বিজ্ঞান-মন্দির।

আজ বিজ্ঞানাচার্যের জীবনের সত্তর বৎসর পূর্ণ হলো। এই

উপলক্ষে তাঁর দেশবাসীর পক্ষ থেকে আজ তাঁকে অভিনন্দিত করা হবে। এই উৎসব জগদীশচন্দ্রের জীবনের একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সেদিন উৎসবের আরম্ভে 'জনগণ-মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা' গানটি গাওয়া হলো। সমবেত সুধী ও সজ্জনবৃন্দের শ্রদ্ধান্বিত ও সানুরাগ দৃষ্টির সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন শুভ্র কেশ, সৌম্যদর্শন, দীর্ঘ সমুন্নতদেহী জগদীশচন্দ্র। প্রতিভার আলোয় তাঁর সমস্ত মুখখানি যেন উদ্ভাসিত। আমরা অনুমান করতে পারি যে, ক্ষণকালের জন্য সেই কীর্তিমান বৈজ্ঞানিককে সন্দর্শন করে সমাগত দর্শকবৃন্দের চিত্তে এই ভাবই জেগে উঠেছিল যে, ভারতবর্ষ নিজের ক্ষমতায় জগৎসভায় মর্যাদার আসন লাভ করবে—বিশ্বের লোক জানবে যে ভারতবাসী বড়। ভারতবাসীর এই স্বপ্ন, এই আশা আজ বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রকে উপলক্ষ করে সার্থক হলো, পূর্ণ হলো।

সুসজ্জিত বেদীর ওপর সমাসীন বৈজ্ঞানিককে দেখে উপস্থিত সকলেই তাই পরম গৌরব বোধ করলেন—সকলের অন্তঃকরণ নিঃশব্দে তাঁর উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করল। দেশের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের ব্রতে তিনি একদিন আত্মোৎসর্গ করেছিলেন এবং জীবনের দীর্ঘকাল সেই দুরূহ ব্রত পালনে তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ। আজ জীবন সায়াহ্নে দেশবাসীর সপ্রীতি ও সকৃতজ্ঞ অভিনন্দনের ভেতর দিয়ে জগদীশচন্দ্র যেন লাভ করেন জীবনের চরম পুরস্কার ও দেশজননীর আশীর্বাদ। আজ তাঁর জীবনব্যাপী আখ্যা সার্থক। তাঁর জীবন ধন্য।

উৎসবের পরিবেশটি ছিল যেমন স্নিগ্ধ তেমনি শান্ত ও ভাবগম্ভীর। ধূপ ও অগুরুর গন্ধে সভাতল হয়ে উঠেছে আমোদিত। শুভ শঙ্খধ্বনির মধ্যে সূচিত হয় জগদীশচরেন্দ্র সপ্ততিতম জন্মোৎসব। মহানগরীর সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এমন অনুষ্ঠান এর আগে কখনো দেখা যায় নি। এই আনন্দ উৎসবের মধ্যে বৈজ্ঞানিক কেবল

অনুভব করেছিলেন একজনের অভাব। তিনি তাঁর আজীবনের বন্ধু রবীন্দ্রনাথ। অনুষ্ঠানের কিছু আগে ২২শে অক্টোবর তারিখে জগদীশচন্দ্র এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, "...তুমি যাহা সাধন করিয়াছ তাহা অবিনশ্বর রহিবে। আর যে বেশী তোমার দান তাহা অযাচিত। সে কার্যে আমি তোমার চির সহায় মনে করিও।

আমরা দু'জনেই প্রবল শত্রুকে প্রবল মিত্র করিয়াছি। তবে যেখানে শত্রুও নাই, মিত্রও নাই, সেই ক্ষুদ্রতার মধ্যে মনের জোর রাখা কঠিন। তাহার মধ্যেও বড় কার্য হইয়াছে এবং হইবে। একথা সর্বদা মনে রাখিও। আমাদের মধ্যে যে বহুদিনের একতা, তাহা দেবতার দান বলিয়া মনে করি।

১লা ডিসেম্বর আমার ৭০ বৎসর হইবে। সেদিন আমি সমস্ত বোঝাপড়া ঠিক করিব, সেদিন তোমার সহিত দেখা হইলে সুখী হইব। তোমার শুভ ইচ্ছা যেন আমাকে সেদিন বলীয়ান করে।

উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ২৪শে অক্টোবর ১৯২৮, ...তোমার ৭০ বছরের অভিনন্দন সভায় নিশ্চয়ই আমি যোগ দিতে যাব। তখন শীতের সময় শরীরে এখনকার চেয়ে বল পাব বলে বিশ্বাস করি।' কিন্তু কবি এই উৎসবে যোগদান করতে না পারলেও প্রিয় করকমলে তাঁর প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন একটি সুদীর্ঘ কবিতায়। উৎসব সভায় কবিতাটি পাঠ করলেন কালিদাস নাগ। কবিতার শেষের কয়েকটি লাইন এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম—

'জ্যোতিষ্ক সভার তলে যেথা তব আসন বিরাজে
সেথায় সহস্র দীপ জ্বলে আজি দীপালি উৎসবে।
আমারো একটি দীপ তারি সাথে মিলাইনু যবে
চেয়ে দেখো তার পানে, এ দীপ বন্ধুর হাতে জ্বালা;
তোমার তপস্যা ক্ষেত্র ছিল যবে নিভৃত নিরালা

ব্যথায় বেষ্টিত রুদ্ধ, সেদিন সংশয় সন্ধ্যাকালে
কবি হাতে বরমাল্য যে বন্ধু পরায়েছিল গলে ;
অপেক্ষা করেনি সে তো জনতার সমর্থন তরে,
দুর্দিনে জ্বেলেছে দীপ রিক্ত তব অর্ঘ্য থালি পরে।
আজি সহস্রের সাথে ঘোষিল সে, ধন্য ধন্য তুমি,
ধন্য তব বন্ধুজন, ধন্য তব পুণ্য জন্মভূমি।'

তারপর দেশ-বিদেশের মনীষীর কাছ থেকে পাওয়া বহু অভিনন্দন-লিপি সভায় একে একে পাঠ করা হয়। পাঠ করেন হাইকোর্টের বিচারপতি চারুচন্দ্র ঘোষ। সেইসব অভিনন্দনের সার কথা ছিল এই যে, সকলেই একবাক্যে জগদীশচন্দ্রকে সত্যদ্রষ্টার আসনে বসিয়েছিলেন। তাঁর প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে প্রখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বললেন, 'আধুনিক কালে বিজ্ঞান ক্ষেত্রে আচার্য বসুই প্রথমে দেখাইয়াছেন, ভারত কেবল দেনাদার নয়, ঋণী নয়, ভিক্ষুক নয়, ভারতের কিছু দিবার আছে।' ভিয়েনার প্রসিদ্ধ উদ্ভিদবিদ্যাবিদ অধ্যাপক হ্যান্‌স মোলিশ, ডাক্তার নীলরতন সরকার, ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার প্রমুখ বিশিষ্ট মনীষীরা একে একে আচার্যকে অভিনন্দিত করলেন। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি কামিনী রায়, ডঃ দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, বি. কে. বসু (নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য) প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশ, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা প্রমুখ।

অভিনন্দনের শেষে জগদীশচন্দ্র ইংরাজীতে উত্তর দিলেন। শান্ত বিনম্র কণ্ঠে তিনি বললেন—'গত চল্লিশ বছর ধরে আমি যে সংগ্রামে নিযুক্ত আছি, জ্ঞানের সীমা বিস্তার করবার জন্য এবং জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডারে ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে কিছু দান করে জাতি-সঙ্ঘের মধ্যে তার একটা সম্মানিত আসন অর্জন করবার জন্য তা করেছি।...আজ পৃথিবীর সভ্যতা লোপের আশংকা ঘটেছে। পৃথিবীব্যাপী ধ্বংস

নিবারণের এক উপায় আছে—তা মানুষের কল্যাণের জন্য মনোরাজ্যে সহযোগিতা।

উৎসবের শেষে একটি মনোজ্ঞ অভিনব অনুষ্ঠান হলো। জ্ঞানের রাজ্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সহযোগিতার প্রতীক হিসাবে একটি নারিকেল থেকে জাত দুটি যমজ চারাগাছ আচার্য বসু ও অধ্যাপক মোলিশ একত্রে রোপণ করেন। উপরের আকাশের দিকে সমুন্নত শীর্ষে সেই প্রবীণ নারিকেল গাছটি বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের সংলগ্ন উদ্যানের এক কোণে আজো দাঁড়িয়ে আছে। তার পত্র-মর্মরে কি সেদিনের সেই বর্ণাঢ্য জন্মোৎসবের ইতিহাস আজো গুঞ্জরিত হয় না? এখানে একটি কথা উল্লেখ্য। আচার্যের সত্তর বৎসর পূর্তি উৎসব কেবলমাত্র বসু-বিজ্ঞান মন্দিরেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এই একই দিনে জগদীশচন্দ্রের দীর্ঘায়ু ও কল্যাণ কামনা করে বিশ্বভারতী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বৃহত্তর ভারত সমিতি ও নিকটবর্তী রামমোহন লাইব্রেরীতে উৎসবের আয়োজন হয়েছিল। এইসব বিভিন্ন মঙ্গল অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে সেদিন জগদীশচন্দ্র যেন তাঁর দেশবাসীর অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দনই লাভ করেছিলেন।

১৯৩১, ১৪ এপ্রিল।

স্থান—কলকাতার টাউন হল।

আজ মহানগরীর পৌর প্রতিষ্ঠান বাংলার সুসন্তান, ভারতের সুসন্তান আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে অভিনন্দিত করলেন। লতায়-পাতায় ও ফুলে সুন্দর করে সেদিন সাজানো হয়েছিল টাউন হলটি। শহরের খ্যাতনামা নাগরিকবৃন্দ সকলেই এই উৎসবে যোগদান করেছিলেন বৈজ্ঞানিককে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। তখন দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসু পৌরপ্রধান (Mayor) ছিলেন। সুরচিত মানপত্রটি তিনিই পাঠ করলেন ও তারপর বিনম্রভাবে সেটি তিনি বিজ্ঞানীর হাতে প্রদান করলেন। সভায় তুমুল হর্ষধ্বনি উঠল। টাউন হলে অনুষ্ঠিত বহু স্মরণীয় সভার মধ্যে এটি ছিল একটি।

অভিনন্দনের উত্তরে বাংলায় জগদীশচন্দ্র বললেন—'এই মহানগরী গত চল্লিশ বছর ধরে আমার কার্য ও সংগ্রামের সহচর হয়েছে। একদিন এই শহরের এক পথের ধারে একটি আগাছা আমাকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল। সেদিন থেকে আমার জীবনে বর্তমান কাজের ধারাটি চলে আসছে। একথা আমাদের ভুললে চলবে না যে আমরা পুণ্যভূমি ভারতের অধিবাসী, এই-ই আমাদের গর্ব, এই-ই আমাদের গৌরব। আমরা আজো ভারতবাসী, আমরা চিরদিনই ভারতবাসী।'

এই বছরটি (১৯৩১) বৈজ্ঞানিকের জীবনে আরো একটি বিশেষ ঘটনার জন্য স্মরণীয় হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে সমগ্র দেশের পক্ষ থেকে বিশ্ব-বরেণ্য কবিকে সংবর্ধনার আয়োজন হয়। সেদিন মহাসমারোহের সঙ্গে যে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়েছিল তার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে জগদীশচন্দ্র পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। একজন সত্তর পার হয়েছেন, অন্যজন সত্তরের কোঠায় পদার্পণ করলেন। এই সভাটিও হয়েছিল সুসজ্জিত টাউন হলে। কবিকে প্রদত্ত অভিনন্দন-লিপি রচনা করেছিলেন অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র আর প্রকাশ্য সভায় সেটি পাঠ করেছিলেন জগদীশচন্দ্র। বন্ধুর কণ্ঠে আবেগভরে উচ্চারিত সেই অভিনন্দনলিপির প্রত্যেকটি কথা সেদিন কবির অন্তরকে স্পর্শ করেছিল।

এই রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে দেশ-বিদেশের জ্ঞানী ও গুণীজনের শ্রদ্ধাঞ্জলি সমন্বিত যে অপূর্ব অভিনন্দন গ্রন্থটি কবিকে দেওয়া হয়েছিল তাতেও জগদীশচন্দ্র তাঁর বন্ধুর উদ্দেশে এই প্রীতির অঞ্জলি রচনা করেছিলেন—'ত্রিশ বছরের অধিক কাল রবীন্দ্রনাথ ও আমি নিবিড় বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ আছি। আমি যখন অপ্রসিদ্ধ ছিলাম, তখন আমার চিরবন্ধু রবীন্দ্রনাথ আমার সঙ্গে ছিলেন। মূক উদ্ভিদের

১। এই অভিনন্দন গ্রন্থটির নাম : GOLDEN BOOK OF TAGORE

জীবনকে আমি যে মুখর করতে পেরেছি, নির্বাক তরুকে আমি যে বাঙ্ময় করতে পেরেছি এ শুধু কবির দৌলতে। আমার জীবনে তাঁর সাহায্য ও ভালবাসা অক্ষয় হয়ে আছে। আমার জীবন সাধনার কেন্দ্রে রবীন্দ্রনাথ। বৈচিত্র্যের মধ্যে বিশ্বের যে একত্ব আমার দৃষ্টিপথে প্রকাশিত হয়েছিল, কবির দৃষ্টিতেও তা আরো সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে—তাঁর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুপম কবিতাবলীর মধ্যে তার প্রকৃষ্ট পরিচয় মিলবে। তাঁর দৃষ্টি আরো প্রসারিত হোক, তাঁর বাণী পৃথিবীর চারিপ্রান্তে ছড়িয়ে পড়ুক—এই আমার অন্তরের কামনা।'

বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম যেমন, তেমনি তাঁর সাহিত্য প্রীতিও ছিল অতুলনীয়। তিনি চিরদিনই মাতৃভাষার অনুরাগী ছিলেন। বাংলা তিনি লিখেছেন কম, কিন্তু যা লিখেছেন তা কবিত্বপূর্ণ, তার সাহিত্যিক উৎকর্ষ সুস্পষ্ট। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ না করে তিনি যদি সাহিত্যের সেবায় জীবনযাপন করতেন তাহলে জগদীশচন্দ্র একজন বড়ো সাহিত্যিক হতে পারতেন। সে প্রতিভার নিদর্শন পাই তাঁর বাংলা লেখার মধ্যে। 'অব্যক্ত' এরই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বিজ্ঞান ও কবিত্বের অপূর্ব সংমিশ্রণে রচিত এই বইখানি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২১ সালে। বর্তমানে আরো অনেক বাংলা রচনার সন্ধান পাওয়া গেছে। সেগুলোকে একত্রিত করে সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এই বই থেকে 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে' শীর্ষক অধ্যায়ের কিছু অংশ এখানে তুলে দিলাম ঃ

'নদীর সেই কুলু কুলু ধ্বনির মধ্যে কত কথাই শুনিতে পাইতাম। নদীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কোথা হইতে আসিয়াছ নদী?' নদী উত্তর করিল, 'মহাদেবের জটা হইতে।' একদিন আমি বলিলাম, নদী, আজ বহুকাল অবধি তোমার সহিত আমার সখ্য। পুরাতনের মধ্যে কেবল তুমি। বাল্যকাল হইতে এ পর্যন্ত তুমি আমার জীবন বেষ্টন করিয়া আছ, আমার জীবনের একাংশ হইয়া গিয়াছ; তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ জানি না। আমি তোমার প্রবাহ অবলম্বন

করিয়া তোমার উৎপত্তি স্থান দেখিয়া আসিব।...এখনও ভাগীরথী তীরে বসিয়া তাহার কুলু কুলু ধ্বনি শ্রবণ করি। এখনও তাহাতে পূর্বের ন্যায় কথা শুনিতে পাই। এখন আর বুঝিতে ভুল হয় না। 'নদী, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ ?'—ইহার উত্তরে এখনও সুস্পষ্ট শুনিতে পাই 'মহাদেবের জটা হইতে'।'

জগদীশচন্দ্র শেষের তিন-চার বছর তিনি নানা রকম শারীরিক অসুস্থতা ভোগ করতেন বলে স্বাস্থ্যলাভের জন্য গিরিডিতে যেতেন ও সেখানে কিছুকাল বাস করতেন। শেষের দিকে ব্যাধিতে তাঁর শরীর অপটু হয়ে গিয়েছিল বললেই হয়। আগেকার মতো গবেষণার কাজ করতে পারতেন না বটে তবে পরামর্শ উপদেশ দিয়ে নবীন বৈজ্ঞানিকদের অনেককে পথ দেখিয়ে দিতেন। তরুণ গবেষকরা সব সময়েই তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা লাভ করতেন আর প্রয়োজনীয় উপদেশ পেতেন। আচার্যের বেদী থেকে অকৃপণ ভাবেই তিনি তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডার উজাড় করে দিতেন।
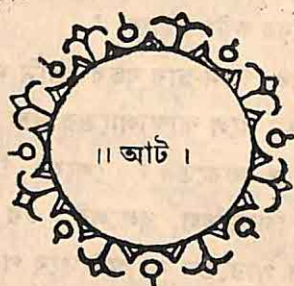
১৯৩৭।

এ বছরের নভেম্বর মাসেও স্বাস্থ্য উদ্ধারের আশায় জগদীশচন্দ্র গিরিডি এলেন। সঙ্গে লেডি অবলা বোস। তিনিই একাধারে ছিলেন তাঁর বৈজ্ঞানিক স্বামীর জননী, জায়া ও বান্ধবী। তিনি ছিলেন তাঁর স্বামীর যথার্থ কর্মসঙ্গিনী। তাঁর সেবা ও পরিচর্যা, স্নেহ ও তত্ত্বাবধান ভিন্ন জগদীশচন্দ্রের প্রতিভা কতখানি সার্থক হতো তা বলা যায় না। এই বছর ৩০ নভেম্বর তাঁর অগণিত বন্ধুবান্ধব, ছাত্র ও আত্মীয়স্বজন আচার্যের ৮০তম জন্মদিন পালন করবার আয়োজন করেছিলেন। এই তিরিশে নভেম্বরই বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস। এই দিনটির জন্য প্রতি বছর তিনি আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষা করতেন। এ বছরও করেছিলেন। নভেম্বর প্রায় শেষ হয়ে এলো। জগদীশচন্দ্র কলকাতায় ফিরবার জন্য ব্যগ্র হলেন। ঠিক হলো ২৮ নভেম্বর রবিবার তিনি ফিরবেন।

২২ নভেম্বর, সোমবার। সন্ধ্যাবেলায় গাড়ি চড়ে বেড়িয়ে এলেন। সেদিন তাঁকে বেশ প্রফুল্লই দেখা গেল। রাত দশটায় শুতে চললেন। পরের দিন মঙ্গলবার। যথারীতি প্রত্যূষে উঠলেন।

সকালে ঘুম থেকে ওঠা তাঁর আজীবনের অভ্যাস। শোবার ঘর থেকে গেলেন স্নানের ঘরে। তিনি চিরকাল সকালেই স্নান করতেন। প্রাতরাশ সাজিয়ে অন্য একটি ঘরে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন বসুজায়া। অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হলো, বাথরুমের দরজা খুললো না। উদ্বিগ্নচিত্তে লেডি বসু গিয়ে স্নানের ঘরের দরজা খুললেন। দেখেন, বাথরুমের মেঝেতে স্বামীর অচৈতন্য দেহ। ডাক্তার এলো তখনি। কিন্তু বৈজ্ঞানিক আর জ্ঞান ফিরে পেলেন না। ১৯৩৭, ২৩ নভেম্বর, মঙ্গলবার সকাল ৮-১৫ মিনিটের সময় বিজ্ঞান জগতের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধার মৃত্যু হলো। নিভে গেল প্রতিভার একটি বহ্নিশিখা।

গিরিডি ছোট্ট শহর। দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়লো। সেদিন বিহার সিভিল সার্ভিসের অফিসার শরৎচন্দ্র বিশ্বাস গিরিডি শহরে হাজির ছিলেন। তিনি তাঁর প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় লিখেছিলেন, "...জগদীশচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবাল বৃদ্ধ বণিতা পুষ্পস্তবক নিয়ে তাদের শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আসেন। দুপুরের মধ্যে বাড়ির সামনের রাস্তা জনসমুদ্রে পরিণত হয়। বিপুল জনতরঙ্গ থেকে বোঝা গেল এই প্রখ্যাত বিজ্ঞানী এই ছোট শহরের অধিবাসীর কত আপনজন ছিলেন। বেলা দুটো নাগাদ শববাহী-গাড়ীটি চলতে আরম্ভ করলে সকলেরই চোখ অশ্রুতে ভরে উঠে—কারণ তাঁরা আর তাঁদের প্রিয় বিজ্ঞানীর সহাস্য মুখটি দেখতে পাবেন না।

৩০ নভেম্বর। বসুবিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উৎসবের দিনেই হলো বিজ্ঞানীর স্মরণ-সভা। সভাপতি রবীন্দ্রনাথ। কবি শোক-বিহ্বল কণ্ঠে তাঁর প্রিয়তম বন্ধুর স্মৃতি তর্পণ করলেন। শুনতে শুনতে উপস্থিত সকলের চোখ সজল হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণের শেষে বললেন—'বিজ্ঞানের সাধনায় জগদীশচন্দ্র তাঁর কৃতিত্ব অসমাপ্ত রেখে যান নি, বিদায় নেওয়ার দ্বারা তিনি দেশকে বঞ্চিত করেন নি।

যা অজর, যা অমর, তা রইল।...তাঁর চরিত্রে সংকল্পের যে একটি সুদৃঢ় শক্তি ছিল, তার দ্বারা তিনি অসাধ্য সাধন করেছিলেন। সমস্ত বাহ্য বাধা অতিক্রম করে তাঁর কর্মজীবন পরিব্যাপ্ত হয়েছিল বিশ্বভূমিকায়।'

ভারতের এই বিজ্ঞানী শ্রেষ্ঠকে তোমরা নিত্য স্মরণ করবে, এই বলে—

'সত্যের মন্দিরে তুমি যে দীপ জ্বালিলে অনির্বাণ
তোমার দেবতা সাথে তোমারে করিল দীপ্যমান।

———

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর
সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী—১৮৫৮-১৯৩৭

১৮৫৮ : ৩০শে নভেম্বর বাংলাদেশের ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ভগবানচন্দ্র বসু মাতা বামাসুন্দরী বসু।

১৮৯০ : কলকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি হন। পরবর্তী-কালে বাংলা দেশের ফরিদপুরে ভর্তি হন।

১৮৭৫ : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বৃত্তিসহ প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এবং সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন।

১৮৮০ : ১৮৭৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আই. এ, ১৮৮০ সালে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করেন।

১৮৮৪ : লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এস. সি. এবং কেম্বিজ থেকে স্নাতক (ট্রাইপস) হন।

১৮৮৫ : কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন।

১৮৮৭ : দুর্গামোহন দাসের কন্যা অবলা দাসকে বিবাহ করেন।

১৮৯৪-৯৫ : কলকাতা টাউন হলে জনসাধারণের সামনে প্রথম ভাষণ দেন, এবং বিনা তারে দূরে বার্তা পাঠানো পরীক্ষা করে দেখান।

১৮৯৬-৯৭ : লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত হন। সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ইয়োরোপ যান। প্রথমে লিভারপুলে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়ান-এ এবং পরে লণ্ডনের রয়্যাল ইনস্‌টি-টিউশনে ভাষণ দেন।

১৯০০-০১ : দ্বিতীয়বার ইয়োরোপ গমন করেন। প্যারিস, লণ্ডন ও ইয়োরোপের বিভিন্ন বিজ্ঞান সভায় গবেষণাপত্র পাঠ করেন ও ভাষণ দেন।

১৯০২-০৬ : তাঁর প্রথম গ্রন্থ Response in the living and non living প্রকাশিত হয়। ১৯০৩ সালে তিনি C. I. E. উপাধিতে ভূষিত হন।

১৯০৮-০৯ : তিনি তৃতীয়বার আমেরিকা ও ইয়োরোপ সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হন, এবং বিভিন্ন সভা ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভাষণ দেন।

১৯১৪-১৫ : চতুর্থবারের ইয়োরোপ ও আমেরিকা সফরে তিনি কেম্বিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দেন। এই সফরে তিনি অস্ট্রিয়া, জার্মানী ও জাপান ভ্রমণ করেন ও বিভিন্ন বিজ্ঞান সভায় ভাষণ দেন। ১৯১৫ সালে ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিস থেকে অবসর গ্রহণ করে প্রেসিডেন্সী কলেজে ‘এমেরিটাস অধ্যাপক’ পদে নিযুক্ত হন।

১৯১৭ : তাঁর উনষাট জন্মদিবসে ১৯১৭ সালের ৩০ নভেম্বর ‘বসুবিজ্ঞান মন্দির’ প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯১৯-২৪ : পঞ্চম ও ষষ্ঠবার ইয়োরোপ সফরে যান। কেম্ব্রিজ অক্সফোর্ড, লীডস, প্রাগ, কোপেল হেগেন প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত বিজ্ঞান সভায় ভাষণ দেন।

১৯২৬-২৯ : ৭ম, ৮ম, ৯ম বার ইরোরোপ যান। ১০ম ও শেষবার যান ১৯২৯-এ। বিশ্বের বিভিন্ন বিজ্ঞান-সভায় বিশিষ্ট বিজ্ঞানী সমাবেশে ভাষণ দেন।

১৯৩১ : শ্রীসয়াজীরাহু গায়কোয়াড় পুরস্কার অর্পণ করা হয়। মেয়র সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে নাগরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

১৯৩৩-৩৫ : বরোদা ভ্রমণ কালে তাঁর গবেষণা ও আবিষ্কার সম্বন্ধে শ্রেণীবদ্ধ ভাষণ দান করেন। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহাকে ডি. এস-সি উপাধিতে সম্মানিত করা হয়। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁহাকে ডি. এস সি উপাধিতে সম্মানিত করে।

১৯৩৭ : ২৩ নভেম্বর গিরিডিতে পরলোক গমন করেন।

শিশুবর্ষে গৃহীত পরিকল্পনার